

FOCUS

Where The Generations Converge

*Department of Physics
City College*

102/1 Raja Rammohan Sarani, Kolkata-700 009

You have to dream before your dreams can come true.

-APJ Abdul Kalam

FOCUS

-Where the generations converge

2018



Department of Physics
City College

102/1 Raja Rammohan Sarani, Kolkata – 700009

*"You have to dream before
your dreams can come true"*

- APJ Abdul Kalam

প্রকাশ : 25শে ফেব্রুয়ারি, 2018

সংখ্যা : দ্বিতীয়

সম্পাদক : ডঃ সমাপ্তি পাল,
অধ্যাপিকা

প্রচ্ছদ : শুভদীপ দে,
প্রথম বর্ষ

অঙ্করবিন্যাস : তিয়াসা চক্রবর্তী, সৌম্য মুখার্জী, অরিত্র গুপ্ত,
প্রসূন ভট্টাচার্য, সৌতন আদক - দ্বিতীয় বর্ষ
শুভদীপ দে, সায়ক ঘোষ, কৌস্তভ মৈত্র - প্রথম বর্ষ

প্রকাশনা : পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ,
সিটি কলেজ,
১০২/১, রাজা রামমোহন সরণী,
কলকাতা - ৭০০০০৯

মুদ্রণ : ব্যানার্জী প্রিন্টিং ওয়ার্কস,
সূর্য সেন স্ট্রিট,
কলকাতা - ৭০০০০৯

নিবেদন

ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহ আর সক্রিয় অংশগ্রহণে পুনরায় প্রকাশিত হল আমাদের বিভাগীয় পত্রিকা – “FOCUS - where the generations converge”।

এই লেখা লিখতে শুরু করে একটা কথা বিশেষভাবে মনে পড়ছে – Focus -এর প্রথম সংখ্যায় যাঁর “স্মৃতিচারণা” দিয়ে পত্রিকার লেখাগুলোর শুভারম্ভ হয়েছিল সেই শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক চিত্তরঞ্জন দাশগুপ্ত মহাশয় আজ আর আমাদের মধ্যে নেই। গত ১২ই ডিসেম্বর ২০১৭ তিনি আমাদের থেকে চিরবিদায় নিয়েছেন। কিন্তু, আমরা জানি আমাদের বিভাগের সাথে জড়িয়ে থাকা এই মানুষটি বেঁচে থাকবেন অনেকদিন তাঁর অগুনতি ছাত্রছাত্রী আর পাঠক-পাঠিকার মনের মধ্যে। আর আমরা চিরকাল তাঁকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করব।

বিগত এক বছরে বিভাগের অনেক পরিবর্তন হয়েছে। বিভাগে নতুন তিনজন অধ্যাপক স্থায়ীপদে যোগদান করেছেন, আর নিয়মের অনুশাসনে সাতজন অতিথি শিক্ষক, যারা অনেকদিন বিভাগের হাল শক্ত হাতে ধরেছিলেন, তাদের বিদায় নিতে হয়েছে। পত্রিকা প্রকাশের জন্য এদের মধ্যে যারা তাদের মূল্যবান সময়ের অনেকখানি ব্যয় করেছিলেন তাদের কথাও খুব মনে পড়ছে। Focus-এর প্রথম প্রকাশের পরিকল্পনার আর প্রকাশের মধ্যে সময়ের ব্যবধান কম থাকায় তখন বিভাগের প্রাক্তনীদের অনেকের সঙ্গেই যোগাযোগ করা বা তাদের লেখা সংগ্রহ করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। এবার আমরা আরও বেশিজনের কাছে অনুরোধ রাখতে পেরেছি তাদের মূল্যবান রচনা দিয়ে আমাদের পত্রিকাকে সমৃদ্ধ করার জন্য। আমাদের ডাকে সাড়া দিয়ে প্রাক্তন আধ্যাপক ও ছাত্ররা তাদের রচনা পাঠিয়ে যেভাবে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন তাতে আমরা অভিভূত। প্রাক্তন অতিথি শিক্ষকরাও তাদের লেখা পাঠাতে ভোলেননি। বিভাগের নবাগত অধ্যাপকরাও উৎসাহের সঙ্গে পত্রিকার প্রকাশে অংশগ্রহণ করেছেন। আর যাদের জন্য এই পত্রিকা সেই ছাত্রছাত্রীরা বিভিন্ন স্বাদের লেখায় ভরিয়ে তুলেছে পত্রিকাকে। ছাত্রদের আঁকাগুলিও নজরকাড়া। পত্রিকার প্রচ্ছদ পরিকল্পনার মধ্যে অভিনবত্বের ছাপ রেখেছে বিভাগের প্রথম বর্ষের এক ছাত্র। সব মিলিয়ে এবারের এই সুন্দর সঙ্কলনটি আশা করি সকলের ভাল লাগবে।

এবছর ছাত্রছাত্রীরা নতুন উৎসাহে পত্রিকার সফটকপি তৈরীর কাজে এগিয়ে এসেছে, কারণ এবারে কর্তৃপক্ষের সহায়তায় তারা তাদের প্রিয় পত্রিকাকে বই আকারে হাতে পাবে। গত বছর পত্রিকা প্রকাশের জন্য অনেক পরিশ্রম করলেও তাদের বহুকাজিত পত্রিকাটি বই আকারে তাদের হাতে তুলে দেওয়া সম্ভব হয়নি, সফটকপি পেয়েই তাদের সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছিল। পত্রিকা প্রকাশে আমাদের এই প্রয়াসকে এইভাবে উৎসাহিত করার জন্য কর্তৃপক্ষের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। সকলের সহযোগিতায় আর শুভকামনায় এমনিভাবেই ভবিষ্যতে আমরা এগিয়ে যেতে পারব এই আশা রেখে শেষ করছি।

– সমাপ্তি পাল, সম্পাদক



ESTD. 1981
NAAC Accredited College

CITY COLLEGE

(Unit of Brahma Samaj Education Society)

Affiliated to the University of Calcutta

'02/1, Raja Rammohan Sarani, (Amherst Street)

Kolkata - 700 009. Phone - 033 2350 6505, 033 6566 0005

Office : 033 2360 7463, E-mail : principal@citycollegekolkata.org

Website : www.citycollegekolkata.org

Ref. No.

Date 15.02.2018

শুভেচ্ছাবার্তা

ডঃ শীতল প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

অধ্যক্ষ, সিটি কলেজ

সিটি কলেজের পদার্থবিদ্যা বিভাগ দ্বারা প্রকাশিত পত্রিকা 'FOCUS - Where The Generations Converge' -এর এটি দ্বিতীয় আন্তঃপ্রকাশ, সেই উপলক্ষে প্রথমেই ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানাই পদার্থবিদ্যা বিভাগের সকল ছাত্রছাত্রী ও অধ্যাপক ও অধ্যাপিকাদের।

বর্তমান সমাজে, ছাত্রছাত্রীরা প্রতিনিয়ত ছুটে চলেছে তাদের লক্ষ্যপূরণের উদ্দেশ্যে। যুগের গতির সাথে তাল রাখতে মেতে উঠেছে একে অন্যকে ছাপিয়ে যাবার প্রতিযোগিতায়। এই সবকিছুর মাঝে তারা বোধহয় হারিয়ে ফেলেছে তাদের সুকুমার প্রবৃত্তিগুলিকে - যা একান্তই তাদের নিজের। এই পত্রিকা সেইসমস্ত সুকুমার চিন্তাধারার আন্তঃপ্রকাশের একটি আদর্শস্থল। শুধু তাই নয় সমকালীন ন্যূনসমাজের ব্যঙ্গসিকতা, চিন্তাধারা, সৃষ্টিশীলতার প্রতিফলন ঘটে তাদের লেখা, ছবি আঁকা ইত্যাদির মাধ্যমে। এই পত্রিকা ভারই এক অনন্য দর্পন। আরও একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হল শুধুমাত্র বর্তমান ছাত্রছাত্রী বা অধ্যাপক ও অধ্যাপিকাদের দ্বারাই নয়, এই পত্রিকা সমৃদ্ধ হয় পদার্থবিদ্যা বিভাগের প্রাক্তন ছাত্রছাত্রী বা অধ্যাপক ও অধ্যাপিকাদের অবদানেও, যা কিনা এখনকার ছাত্রছাত্রীদের কাছে অনুপ্রেরণার পাথর স্বরূপ। তাই আবারও পদার্থবিদ্যা বিভাগের এই পত্রিকা প্রকাশনার আয়োজনকে সাধুবাদ জানাতে চাই। আশা রাখি বছর বছর আরও সমৃদ্ধ হয়ে প্রকাশিত হোক এই পত্রিকা। আমার শুভেচ্ছা রইল।



Shital Prasad Chatterjee
15.02.2018

From the Head of the Department

As one year draws to a close, since the time we had first published our departmental magazine, I cannot help but remember all those who had contributed towards making this issue's publication possible. Dr Samapti Pal, our editor had worked tirelessly for the past three months in making this issue possible. Although nobody is supposed to be indispensable but for me my colleague and beloved sister Samapti is. Her dedication and sincerity deserve a special mention.

Although a supervisor is always important for such work, it must not be forgotten that the physical burden is too great for one person to bear. In this context comes our children - our students. They have worked a lot for this issue, never disobeying our slightest suggestions or instructions, whichever one may call these. Naturally I feel predisposed towards my students as without fail they have been able to carry out all the work courteously and with a smile.

I am very grateful to our Principal, Dr Sital Prasad Chattopadhyay for his help towards the publication, as he has allowed the full sponsorship of this magazine from our college fund.

I wish that this legacy would continue for years to come even in my absence. To our students, I wish them all the success in life from the core of my heart.



Dr Mitali Middya,
Head of the Department,
Department of Physics,
City College,
Kolkata 700009

CONTENTS

1. নিবেদন.....	i
2. শুভেচ্ছাবার্তা	ii
3. From the Head of the Department	iii
4. চিত্র (সৌরভ বণিক)	1
5. CRDG-কে যেমন দেখেছি (তরুণ কুমার তপাদার)	2
6. অজুহাত (অরিত্র গুপ্ত).....	6
7. গাড়োয়ালের পথে (সৌম্য চ্যাটার্জি).....	8
8. শহরে বৃষ্টি আজ (অর্ণব চক্রবর্তী).....	15
9. ভিক্ষু মা (উৎপল চন্দ্র দাস).....	15
10. চিত্র (চিরন্তন সিনহা).....	15
11. মা (সায়ক ঘোষ)	16
12. "ভালো আছি ভালো থেকো" (অরিত্র বিশ্বাস)	17
13. স্বপ্ন না সত্যি (দুর্লভ দত্ত).....	18
14. সভ্যতা (শুভদীপ দে)	21
15. সিটি কলেজ (সৌভিক খামরুই).....	21
16. Schrodinger's Cat (দেবব্রত দেব)	22
17. মুখ্য (অচ্যুত কুমার চক্রবর্তী).....	24
18. The Integral Quantum Hall Effect [IQHE] (Dr. Amiya Bhushan Biswas).....	25
19. কয়েকটি সংখ্যার আখ্যান ও কুসংস্কার (অনিরুদ্ধ রায়).....	31
20. ধন্দ পুরাণ (ডঃ অমিতাভ পাল).....	36
21. সেরা গবেষণাপত্রের সন্ধান (ডঃ ভূপতি চক্রবর্তী).....	41

22.	জ্বালানি কোশ - একটি বিকল্প শক্তির উৎস (ডঃ অংশুমান নন্দী).....	43
23.	The Annus Mirabilis (Dr. Kausik Mukhopadhyay)	45
24.	আইনস্টাইন: দূরের মানুষ? (পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়)	47
25.	স্মরণে সত্যেন্দ্রনাথ (ডঃ সমাপ্তি পাল)	54
26.	Experience of C. K. Majumdar memorial workshop on experimental physics (সায়ক ঘোষ ও শুভদীপ দে).....	58
27.	Departmental SEMINAR 2018 (Pictures)	59
28.	আমরা হলাম...Team of Focus (বাসবদত্তা চক্রবর্তী)	60
29.	Departmental PICNIC 2018 (Pictures).....	63
30.	Department of Physics (Former & Present).....	64



– সৌরভ বণিক, তৃতীয় বর্ষ

CRDG-কে যেমন দেখেছি

– তরুণ কুমার তপাদার, প্রাক্তন অধ্যাপক

পদার্থবিদ্যার ছাত্র এবং শিক্ষক মহলে অধ্যাপক চিত্তরঞ্জন দাশগুপ্ত এক অত্যন্ত সুপরিচিত নাম। ছাত্র-ছাত্রীরা অবশ্য তাঁকে CRDG নামেই চেনে। ৬০-এর দশকের প্রথমদিকে উচ্চমাধ্যমিক ক্লাসে বাংলায় লেখা ফিজিক্সের বই বলতে প্রফেসর দাশগুপ্তের লেখা বইকেই বোঝাত। পরে অন্যান্য লেখকের বইও বেরিয়েছে। কিন্তু ততদিনে CRDG নামটা ছাত্র-ছাত্রীদের মনে বিশেষ স্থান করে নিয়েছে।



প্রফেসর দাশগুপ্তকে আমি প্রথম দেখি ১৯৭৪ সালের মার্চ মাসে। আমি ফিজিক্সের অধ্যাপক পদের নিয়োগপত্র নিয়ে সিটি কলেজের ফিজিক্স ডিপার্টমেন্টে ওনার সঙ্গে দেখা করি। সেই সময় তিনি ছিলেন বিভাগীয় প্রধান। তখন তাঁর প্রায় পঞ্চাশ বছর বয়স হবে। আদির পাঞ্জাবী আর ধুতি পরা ধোপ দূরস্ত নিখুঁত বাঙালী পোশাক। মেদহীন ঋজু শরীর। পায়ে চকচকে পাম্পশু। কর্মজীবনের শেষদিন পর্যন্ত পোশাকের এই পরিপাট্য তিনি বজায় রেখেছিলেন।

প্রায় ১৫ বছর চিত্তবাবুর সঙ্গে কাজ করার সুযোগ হয়েছিল আমার। এই সময় দেখেছি নিজের ছাত্র না হলে বয়সে অনেক ছোট অধ্যাপককেও তিনি আপনি বলে কথা বলতেন। এমনকি আমাকেও তিনি তরুণবাবু আপনি বলে সম্বোধন করতেন। যদিও বয়সে আমি CRDG-র থেকে

২০ বছরের ছোটো। অথচ প্রফেসর মধুসূদন দত্ত এবং প্রফেসর এইচ.এল. চ্যাটার্জিকে তিনি তুমি বলে ডাকতেন। পরে জেনেছিলাম ওনারা সিটি কলেজে প্রফেসর দাশগুপ্তের ছাত্র ছিলেন।

যখনকার কথা বলছি তখন ডিপার্টমেন্ট যেভাবে পরিচালিত হত এখনকার সঙ্গে তার বিস্তর ফারাক। ডিপার্টমেন্টের কাজকর্ম মূলতঃ বিভাগীয় প্রধানই নিয়ন্ত্রণ করতেন। ডিপার্টমেন্টাল রুটিন থেকে আরম্ভ করে পাস্ এবং অনার্সের কোন্ অংশ কোন্ শিক্ষক পড়াবেন CRDG নোটিস আকারে তা লিখে দিতেন। কখনো কখনো বিভাগের প্রবীণ অধ্যাপকদের মতামত তিনি জানতে চাইতেন। ডিপার্টমেন্টাল কমিটি বলে তো তখন কিছু ছিল না। হেডকেই সব দায়িত্ব নিতে হত। যতদূর মনে করতে পারছি ডিপার্টমেন্টের বিভিন্ন কমিটিগুলি গঠন করা হয়েছিল প্রফেসর মধুসূদন দত্ত মহাশয়ের আমল থেকে। সেই সময় সেমিনার লাইব্রেরী বলতে ডিপার্টমেন্টে একটা মাত্র বইয়ের আলমারি ছিল। এর দায়িত্ব CRDG দেয়েছিলেন প্রফেসর বিলাপ চক্রবর্তী মহাশয়কে। পরে প্রফেসর ইন্দু শেখর কুণ্ডু এই দায়িত্ব পালন করতেন। রুটিন করার দায়িত্বে ছিলেন প্রফেসর অজয় কুমার জোয়ারদার। ল্যাবরেটরির দায়িত্ব নিয়েছিলেন ডঃ প্রতীপ কুমার সেন। এ সবকিছুই হয়েছিল CRDG-এর ব্যবস্থাপনায়। অনার্সের অ্যাডমিশন প্রিন্সিপল, ক্লাস প্রমোশনের নীতি নির্ধারণ হেডই করে দিতেন। এসব পড়ে কেউ যেন মনে না করেন যে CRDG নিজের মর্জিমাফিক ডিপার্টমেন্ট চালাতেন। আসলে সেই সময় ডিপার্টমেন্টগুলি হেডনির্ভর ছিল এবং তার অ্যাডমিনিস্ট্রেশন স্টাইলও এরকমই ছিল। চিত্তবাবু শুধু সেই ধারাকেই অব্যাহত রেখেছিলেন।

কলেজ খোলা আছে অথচ চিত্তবাবু কলেজে আসেননি এমন দিন মনে করতে পারছি না। শিক্ষকরা সময় মত ক্লাসে গেলেন কিনা সে ব্যাপারে তাঁর বিশেষ নজর থাকত। হেড হওয়ার সুবাদে শুধুমাত্র কর্তৃত্ব করার মানসিকতা থেকে তিনি এসব করতেন বলে মনে হয় না। কলেজে ডিসিপ্লিন রাখতে হলে শিক্ষকদের সঠিক সময় ক্লাসে যাওয়াটা জরুরি বলে তিনি মনে করতেন। তিনি নিজে কখনো দেরি করে ক্লাসে যেতেন না। শিক্ষকরাও এই ব্যাপারে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলেন।

সিটি কলেজে CRDG দীর্ঘ ৪৩ বছর শিক্ষকতা করেছেন। এত দীর্ঘ সময় আর কোন শিক্ষক এই কলেজে শিক্ষকতা করেছেন বলে মনে হয় না। নিজের বিভাগে তো বটেই অন্যান্য বিভাগের অধ্যাপক এবং কলেজের অশিক্ষক কর্মচারীরাও তাঁকে যথেষ্ট সমীহ করতেন। অনেকবার গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান করুণা কেতন সেন মহাশয়কে ফিজিক্স ডিপার্টমেন্টে এসে চিত্তবাবুর সঙ্গে কলেজ এবং ডিপার্টমেন্ট সম্বন্ধে আলোচনা করতে দেখেছি।

চিত্তবাবু ডিপার্টমেন্টের বাইরে খুব একটা যেতেন না। অথচ বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের প্রধান সহ অনেক প্রবীণ অধ্যাপক প্রায় নিয়মিত বিকাল ৪-৩০ মিনিট নাগাদ আমাদের বিভাগে আসতেন। এই সময় ডিপার্টমেন্টে বেশ মজার মজার আলোচনা হত। অবশ্যই চিত্তবাবু ছিলেন এই আসরের মধ্যমণি। প্রবীণ শিক্ষকদের এই মজলিশ চলত বিকাল ৫টা পর্যন্ত। আমরা বেশীর ভাগ সময় শুধু শ্রোতার ভূমিকায় থেকে এর স্বাদ গ্রহণ করতাম। চিত্তবাবু বিভিন্ন প্রসঙ্গ উত্থাপন করে আলোচনার

সূত্রপাত করতেন। মাঝে মাঝে ঢীকা-ঢীপ্লনিসহ মন্তব্য করে আসরটিকে প্রাণবন্ত করে রাখতেন। এই সময় তাঁকে পরিচিত CRDG থেকে কিছুটা অন্যরকম লাগত।

বেশ কিছু বছর একসঙ্গে কাজ করে আমার মনে হয়েছে CRDG-এর সঙ্গে কথা বলা, গল্প করা যায়। হয়ত সহকর্মী হিসাবে কিছুটা কাছাকাছিও যাওয়া যায়। কিন্তু অন্তরঙ্গতা বোধ হয় গড়ে ওঠে না। রুটিনমাসিক চলাটাই তাঁর পছন্দ ছিল। তাই অনেক মজার আলোচনার পরেও আমাদের সঙ্গে তাঁর বেশ কিছুটা দূরত্ব থেকেই যেত। হতে পারে বিভাগীয় প্রধান হওয়ার কারণে এই সীমারেখা তাঁকে বজায় রাখতে হত। অথবা এটাই হয়তো তাঁর ব্যক্তিত্ব, যেটা তিনি সযত্নে রক্ষা করে চলতেন।

যেদিন প্রথম বর্ষের ক্লাস শুরু হত সেদিন চিত্তবাবু একটু তাড়াতাড়ি কলেজে আসতেন। আমরাও এতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলাম। ঐদিন তাঁকে খুবই উৎফুল্ল হাসিখুশি দেখাত। পরে বুঝেছিলাম কলেজে এত নতুন নতুন ছাত্ররা পড়তে আসছে এতে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হতেন। আসলে অধ্যাপনার কাজটা তিনি ভালোবেসেই গ্রহণ করেছিলেন।

সময় সুযোগ পেলে চিত্তবাবু টেনিস খেলা বিশেষ করে টেনিসের গ্র্যান্ডসলাম টুর্নামেন্টের খেলা দেখতেন। টেনিস তাঁর প্রথম পছন্দের খেলা। এছাড়া ক্রিকেটেও চিত্তবাবু যথেষ্ট আগ্রহ দেখাতেন। এমন অনেকবার হয়েছে চিত্তবাবু ডিপার্টমেন্টে এসে প্রশ্ন করতেন, কি তরুণবাবু! এবার উইম্বলডন কে জিতবে বলে মনে হয়? অথবা বলতেন কি হল! গাভাসকার তো এবারও রান পেল না! এমনি নানান ছোটখাটো ঘটনায় বোঝা যেত বই লেখা এবং অধ্যাপনার বাইরেও তাঁর কিছু আকর্ষণ ছিল। আর একটা কথা এখানে বলে রাখা ভালো, সত্যজিৎ রায়ের লেখার খুব ভক্ত ছিলেন তিনি। সেইসময় সত্যজিৎ রায়ের ছোট গল্পের বইগুলি (এক ডজন গল্প/ আরও এক ডজন/ এবার বারো ইত্যাদি) প্রকাশিত হয়েছিল। বিকালের দিকে যখন ক্লাসের চাপ কম থাকত তখন প্রায়শই জিজ্ঞেস করতেন, ‘খগম’ গল্পটা পড়েছেন? অথবা ‘বাতিকবাবু’ গল্পটা কেমন লাগল? এটা হতে পারে ছেলেমেয়ের জন্য বই কিনে উনি নিজেও সেগুলি আগ্রহ নিয়ে পড়ে ফেলতেন।

বয়সে আমি CRDG-এর থেকে প্রায় ২০ বছরের ছোট ছিলাম, মনে হয় উনি একটু বেশীই স্নেহ করতেন আমাকে। তাই ছেলেকে ‘অরুণ্যদেব’-এর পোশাক বানিয়ে দিয়েছেন এখবরও বলেছেন। আবার ছেলে যখন মেডিক্যালের প্রথম বর্ষের পড়া ছেড়ে ইঞ্জিনিয়ারিং-এ চলে গেল সে খবরও জানিয়েছেন। আমি এসব প্রসঙ্গ উল্লেখ করলাম এই কারণে যে বাইরে থেকে তাঁকে যতটা স্বভাবগম্ভীর বলে মনে হত তিনি ঠিক ততটা ওইরকম বোধ হয় ছিলেন না।

আমি বেশ কয়েকবার CRDG-এর সঙ্গে তাঁর বইয়ের পাব্লিসার, বুক সিভিকিটের অফিসে গিয়েছি। সেখানে আরও অনেক লেখক বিকেলের দিকে আসতেন। প্রকাশক চা বিস্কুট সহযোগে সকলকে আপ্যায়ন করতেন। আবার রসিকতার সঙ্গে লেখা সংক্রান্ত কিছু অভিযোগও করতেন। লক্ষ্য করেছি CRDG-কে সেইরকম কোন অভিযোগ শুনতে হয়নি। বুঝতে পেরেছিলাম এখানেও CRDG অন্যদের থেকে একটু বেশীই সমীহ পেতেন।

দীর্ঘদিন এই প্রতিষ্ঠানে কাজ করার ফলে সিটি কলেজ এবং ফিজিক্স ডিপার্টমেন্টের প্রতি তাঁর একটি বিশেষ আকর্ষণ তৈরি হয়ে গিয়েছিল। অবসর নেওয়ার পর তিনি অনেকবারই ডিপার্টমেন্টে এসেছেন। আমরা তাঁকে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আসার আমন্ত্রণ জানাতাম। আমন্ত্রিত হয়ে তিনি খুব খুশি হতেন। অনেক পুরনো কথা বলতেন। সকলের খোঁজখবর নিতেন। আমরাও সেই আগের CRDG-কে খুঁজে পেতাম।

৯২ বছর বয়সে প্রফেসর দাশগুপ্ত যখন বার্ষিক্যজনিত রোগে শয্যাশায়ী তখন আমারও ৭২ বছর বয়স হয়ে গেছে। এই সময় ডিপার্টমেন্টের এক অনুষ্ঠানে এসে প্রফেসর এইচ.এল. চ্যাটার্জির কাছে জানতে পারলাম অসুস্থ CRDG আমাকে দেখতে চেয়েছেন। আমার নিজেরও ইচ্ছে হয়েছিল একবার তাঁর সঙ্গে দেখা করে আসি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যাওয়া আর হয়ে ওঠেনি। CRDG আজ আমাদের মধ্যে নেই। চাকরিজীবনে তাঁর কথার মর্যাদা দিতে সবসময় চেষ্টা করেছি। কিন্তু তাঁর শেষ ইচ্ছেটা পূরণ করতে পারিনি। একটা আফশোষ রয়ে গেল। চিত্তবাবুর ছেলে বাবার শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে যাবার জন্য বলেছিল, শারীরিক অসুস্থতার জন্য যাওয়া হয়নি। এই কথাগুলো মনে পড়লে খুবই খারাপ লাগে।

প্রফেসর দাশগুপ্ত সম্বন্ধে কিছু কথা বলতে চেষ্টা করেছি। অনেক কথাই বলা হল না। এতগুলো বছর একসঙ্গে কাজ করায় কত ঘটনার কথাই মনে পড়ে। তার সবকিছু লেখায় প্রকাশ করা যায় না। আর আমি তা পারবও না। ওগুলো আমার মনেই থাক।

অজুহাত

– অরিত্র গুপ্ত, দ্বিতীয় বর্ষ

ছোটবেলা থেকেই শুনে আসছি যে দেবতাদের তৃতীয় নয়ন থাকে, এবং ওটা দিয়ে তেনারা নাকি অনেক অলৌকিক কাজ করতে পারেন। তৃতীয় নয়ন দেবতাদের কাছে একটি বিশেষ অস্ত্র যা তারা বিশেষ কাজে ব্যবহার করেন। ভগবান বড় দয়ালু, তিনি আমাদের নিরাশ করেননি, আমাদেরও একটা মোক্ষম অস্ত্র তিনি দান করেছেন - অজুহাত। কতকগুলো উদাহরণ দিয়ে এই অস্ত্রের ধার কতটা একটু দেখা যাক।

কতজন কত সুন্দর করে কত কিছু লেখে, কিন্তু আমার লেখনি বরাবরই কেমন যান চুপচাপ থাকতে চায়, যখনই তাকে দিয়ে কিছু বলানোর চেষ্টা করি ততবারই সে বলতে চায় সব জিনিসটা সবার জন্য নয়, সাহিত্য সৃষ্টি তোর কাজ নয়, ওটা বাকিদের করতে দে.... আর আমিও নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে যাই। মনে হয় লিখব যে বিষয়টা কি? কি নিয়ে লিখব? আসলে এটা অজুহাত মাত্র, প্রকৃতপক্ষে আমার সেই দৃষ্টিটাই নেই, তাই কত সুন্দর বাস্তব প্রেক্ষাপটকে লোকজন উপস্থাপন করতে পারে আর আমি পারি না। এবার যদি নিজেকে জোর করে একটু লেখক বানানোর চেষ্টা করি তাহলেই আবার অজুহাতের সম্মুখীন হব। চারিদিকে কত কাজের কথা মনে পড়বে, এই JAM-এর MCQ প্র্যাকটিস করতে হবে, ইলেক্ট্রনিক্সের পড়া ধরবেন স্যার, থার্মোডায়নামিক্সটা এখন বাকি আছে ইত্যাদি ইত্যাদি। লেখাটা যেন সময়ের অপব্যবহার, অথচ আমি ঠিক জানি, এখনি যদি লেখাটা বন্ধ করে দিই তাহলে ইলেক্ট্রনিক্স বইটা নয়, ইলেক্ট্রনিক গ্যাজেট, অর্থাৎ আমার ফোনটা আমায় হাতছানি দিয়ে ডাকবে, যার আহ্বানে আমি সাড়া না দিয়ে থাকতে পারব না, মনে হবে সারাদিনে অনেক সময়, মন দিয়ে পড়লে কত সময়.... আমি যদি ৫ মিনিট ফোনকে সময় দিই মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে না। কিন্তু এই ৫ মিনিট কখন যে ৫০ মিনিট হয়ে যাবে তা বুঝতে পারব না। তখনও অজুহাত আমার এই সময়ের ব্যবহারটা ভালো কাজে লাগল তা বোঝাতে ব্যস্ত থাকবে। বলবে ভালই হয়েছে, দেশ বিদেশের কিছু খবর তো জানা গেল, গান শুনে মনটা তো ফ্রী হল - এবার ভালো করে পড়া যাবে। আজব জিনিস এই অজুহাত, আমি যাই ভুল করি তারই মনঃপূত ব্যাখ্যা ঠিকই বানিয়ে দেয়। আমাদের তৃতীয় হাত খুবই শক্তিশালী, ধরুন আমায় কোন একটা কাজ করতে বলা হল, খুবই সামান্য - এই যেমন আমায় যদি কেউ বলে বাবা, এই বাক্সটা একটু তুলে দাও তো, বাক্সটা তোলার বদলে যদি আমি কোন একটা জুতসই অজুহাত প্রয়োগ করি তাহলেই কেবলমাত্র - কাজ হয়ে গেল, মানে কাজটা এড়িয়ে যাওয়া গেল। করতেই হলনা। তাতে কাজটা থেমে থাকল না, হয়ত অন্য কেউ করে দিল। তাই মাঝে মাঝে মনে হয় অজুহাত আমার ডান হাতের থেকেও শক্তিশালী।

কিন্তু এটাই যখন আমার সাথে ঘটবে, ধরা যাক পড়াশোনার ক্ষেত্রে, যে উদাহরণটা আগে বলছিলাম, সেই কাজটা তো অন্য কেউ করে দিতে পারেনা, আমাকেই করতে হবে। তখন অজুহাত মারাত্মক ব্যাধি হয়ে দাঁড়ায়, মনে হয় সমস্ত মনকে যেন ওই চালনা করছে - কিছুতেই নিজের আয়ত্তে আনতে পারছি না। অথচ অছিলা, ঋণাত্মক যুক্তি, অজুহাত না থাকলে ঠিক সময়ে নিজের ঠিকঠাক কাজ করতাম, আর আমার বিশ্বাস সব কাজেই সাফল্য লাভ করতাম। এই অসাফল্যের পিছনে আছে অজুহাত যা নিয়মিতভাবে আমাদের আলস্যকে প্রশ্রয় দিয়ে আসে। যে কোন কাজ করার আগে আলস্য আমাদের বাধা দেয় বারবার যেন বলে পরে করলেও হবে - আর সেই কাজ পরে হবে বলে অসমাপ্তই থাকে, বাস্তবায়িত আর করা হয় না। আর আমাদের এই আলস্যকে সমর্থন করে বহু যুক্তি-অজুহাত আমাদের কর্মোদ্যমকে কমিয়ে দেয়। বারবার মনঃপূত কিন্তু উল্টো যুক্তি দিতে থাকে। যেন স্রোতের বিপরীতে যেতেই দিতে চায় না। খুব শান্ত মাথায় ভালো করে ভাবলে, নিজেরই এই অক্ষমতা দেখলে, আর ভ্রান্ত যুক্তিগুলি বিচার করলে হাসি পায়।

অথচ চারিদিকে তাকালেই দেখতে পাই শুধু আমিই নই, সবাই-ই এর শিকার। ট্রাম, বাস, ট্রেন-এ লোকে লোক ঠকাতে ব্যস্ত। কেউ বসার জায়গা পাওয়ার জন্য শারীরিক অক্ষমতা, কেউ অকালবার্ধক্য ইত্যাদির সাহায্য নিয়ে থাকে। মানে মিথ্যাচার করে, কিন্তু শুধু যদি এই পর্যন্ত হত তাহলেও সমস্যা কিছুটা কম ছিল, পরে অন্তত ওই ব্যক্তিবর্গ বুঝতে পারত যে তারা ভুল করছে। এইভাবে তাকেও কেউ ঠকাতে পারে। কিন্তু আবার খেল দেখায় অজুহাত। অজুহাত তার মনে মনে হাজারো যুক্তি দেখিয়ে বোঝাতে চাইবে যে না এইটুকু মিথ্যাচার যুক্তিযুক্ত, এতে কোন ক্ষতি নেই। তার সাথেও কেউ কোনদিন এই রকম আচরণ করেছিল। অজুহাত আমাদের বিবেকটাকে অন্ধ করে দেয়। অথচ আমরা কোনদিন ভেবে দেখিনা যে প্রকৃতপক্ষে অক্ষম অসহায় ব্যক্তিকে ভিড় বাসে আমার নিজের জায়গাটা ছেড়ে দিলে, ওই সামান্য ত্যাগ স্বীকার কি পরিমান মানসিক তৃপ্তি দিতে পারে। তার বদলে এই অজুহাত আমাদেরকেই অক্ষম বানিয়ে দেয়।

আর একটা উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। আমরা জানি ঠাকুরের পূজা শুদ্ধ ভাবে করতে হয়। এখনই এতে বিন্দুমাত্র ভুল হলে, আমরা তা সংশোধন না করে বা কেন হল তা পর্যালোচনা না করে বা ভবিষ্যতে যেন না হয় তার কথা না ভেবে আমরা বলি ঠাকুরের কাজ, তার এটাই ইচ্ছা ছিল তাই হয়েছে, মানে দোষটা ঠাকুরের, আমার নয়।

এই রকম বহু হাস্যকর যুক্তি আমরা দিই যা ঠিক না ভুল তা নিয়ে পর্যালোচনা আমরা করি না বা করতে চাই না। যদি করতাম তবে আমরা নিজেরাই নিজেদের এই কার্যকলাপে লজ্জিত হতাম। নিশ্চিতভাবে ভুল কাজ জেনেও শান্তি পাবার জন্য ভুলকে ঠিক ভাবার চেষ্টা করে মনের কাছে উল্টোপাল্টা যুক্তি উপস্থাপন করতাম না; ভুলকে ভুল বলে চিহ্নিত করে সংশোধন করার চেষ্টা করতাম। এই কল্পনা বা মনগড়া যুক্তির দ্বারা চালিত না হলে আমরা যেকোনো কাজে সাফল্য লাভ করতে পারতাম। ইলেক্ট্রনিক্স, থার্মোডায়নামিক্সের সাথে সাথে আমি সাহিত্যচর্চাটাও করতে পারতাম।

গাড়োয়ালের পথে

– সৌম্য চ্যাটার্জি*, প্রাক্তন ছাত্র

২৫শে ডিসেম্বর ২০১৬, ভোর ৪টে: তুঙ্গনাথ ট্রেকে বেরিয়ে আপাতত হরিদ্বার স্টেশনে বসে ডাইরি লিখছি। সময়টা ডিসেম্বরের শেষ তাই ঠাণ্ডা এই হরিদ্বারেই রীতিমতো হাড় কাঁপানো আর তার সঙ্গে রয়েছে কনকনে হাওয়া। তাই হিসেবমতো ৩০ সেন্টিগ্রেড হলেও, ঠাণ্ডা তার থেকে অনেকটাই বেশী বলে মনে হচ্ছে। দলে সবসুদ্ধ আমরা ছ'জন এবং বয়সের ব্যবধান থাকলেও সকলেই বন্ধুস্থানীয় হওয়ায় দল বাঁধতে অসুবিধে হয়নি। কথায় বলে “The journey of a thousand miles begins with a single step”, কিন্তু গবেষণার ব্যস্ততায় কাটতে থাকা রোজকার রুটিন থেকে বেড়াতে যাওয়ার লম্বা ফুরসত বিশেষ পাওয়া যায় না। তাই দৈনন্দিন পেশা আর বেড়ানোর নেশা এই দুইয়ের টর্কে যখন আমাদের দিন কাটছিল, সেই সময় ঠিক হল এবারের বড়দিন উদ্‌যাপন করা হোক পাহাড়ে এবং গন্তব্য তুঙ্গনাথ।

তুঙ্গনাথের নামের সঙ্গে যাদের পরিচয় নেই তাদের জানাই, ভারতের ধর্মীয় তীর্থগুলির মধ্যে পঞ্চকৈদার অন্যতম। পাঁচটি শিবমন্দির - কৈদারনাথ, রুদ্রনাথ, তুঙ্গনাথ, মধ্যমহেশ্বর ও কল্লেশ্বর-কে নিয়ে তৈরি পঞ্চকৈদারের মধ্যে তৃতীয় এবং উচ্চতম কৈদার হল তুঙ্গনাথ। পুরাণমতে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পরে শিব এবং পাণ্ডব ভীমের মধ্যে এক দ্বন্দ্ব শুরু হয় গুপ্তকাশীতে। ভীমের নজর এড়াতে শিব ষাঁড়ের ছদ্মবেশ ধরেন (তাই নাম গুপ্তকাশী)। কিন্তু ভীম তাঁকে চিনতে পারায় শিব মাটির নীচে অদৃশ্য হয়ে যান। পরে সেই ষাঁড়ের বিভিন্ন অংশ এই পাঁচটি জায়গায় প্রকট হয়- কৈদারনাথে কুঁজ, রুদ্রনাথে মুখ, তুঙ্গনাথে বাহু, মধ্যমহেশ্বরে নাভি ও কল্লেশ্বরে মাথা। আবার অন্য একটি মত বলে পঞ্চকৈদার বাদেও কপালের কিছুটা অংশ নেপালের পশুপতিনাথে প্রকট হয়েছিলো। কথিত আছে যে, পাণ্ডবরাই এই পাঁচ জায়গায় পাঁচটি শিবমন্দির তৈরি করেন ও পূজো শুরু করেন। এতে তাদের যুদ্ধের পাপ মুক্তি হয়। যাই হোক, কৈদারনাথের কথা বাঙালি মাদ্রেই জানে। কিন্তু তুঙ্গনাথ তেমন জনপ্রিয় নয় সাধারণ পর্যটকদের কাছে, আর এটা মূলত এর উচ্চতার কারণে। পৃথিবীর মধ্যে উচ্চতম শিবমন্দির এটি। সমুদ্রতল থেকে প্রায় ১২,০০০ ফুট উঁচুতে এর অবস্থান এবং সে কারনেই বছরের বিশেষ কিছু সময়ই এখানে যাওয়া সম্ভব। মজার কথা এটাই যে এখন ভীষণই অফসিজন। মন্দির তো বন্ধই, রাস্তাও বরফের তলায়।

হরিদ্বার থেকে আজ আমাদের গন্তব্য চোপতা, যাকে সৌন্দর্যের জন্যে বলা হয় ভারতের সুইজারল্যান্ড। তারপর সেখান থেকে আগামিকাল তুঙ্গনাথের ট্রেক। চোপতা থেকে তুঙ্গনাথের দূরত্ব প্রায় সাড়ে তিন কিমি। কিন্তু উচ্চতার নিরিখে দেখলে প্রায় ৪,০০০ ফুট। তুঙ্গনাথের আরও একটা বিশেষত্ব হচ্ছে পঞ্চকৈদারের মধ্যে এটিই একমাত্র মন্দির যেখানে পূজারি দক্ষিণ ভারতীয় নন। এখানে পূজো করেন খাশি ব্রাহ্মনরা, যারা কাছের গ্রাম মকুমঠের স্থানীয় ব্রাহ্মন। হরিদ্বার থেকে চোপতা প্রায় ১৮০ কিমি। নিজস্ব গাড়ি করে গেলে ছ'ঘণ্টার আশেপাশে সময় লাগার কথা

কিন্তু পাহাড়ি রাস্তায় সময় আন্দাজ করা খুব মুশকিল। তাছাড়া খাওয়া-দাওয়া ইত্যাদির জন্যে মাঝপথে থামার ব্যাপারও থাকে। তবে সবকিছু ঠিকঠাক চললে সন্ধ্যার আগেই চোপতা পৌঁছে যাওয়া উচিত। তারপর গাড়োয়াল হিমালয়ের কোলে আমাদের প্রথম রাত্রিবাস। আজ বড়দিন আর তার সঙ্গে পূর্ণিমা। আর বরফের রাজ্যে পূর্ণিমার মজাই আলাদা।

সকাল ১০টা: পাহাড়, পাহাড় আর পাহাড়। হরিদ্বার ছেড়ে আমাদের ইনোভা ছুটে চলেছে চোপতার দিকে আর তার কাচ দিয়ে যেকোনো তাকাই কেবল পাহাড় আর তার কোল বেয়ে একেবেঁকে এগিয়েছে ৫৮ নম্বর জাতীয় সড়ক। ভীষণ ঝকঝকে, মসৃণ রাস্তার একদিকে পাহাড় আর অন্যদিকে রাস্তা থেকে প্রায় চল্লিশ ফুট নীচে বয়ে চলেছে গঙ্গা। চওড়াতে তা কলকাতার গঙ্গার থেকে অনেকই সরু কিন্তু স্রোত অনেকটাই বেশি। এই রাস্তার ধারে দাঁড়িয়েই ট্যুরের প্রথম সূর্যোদয় দেখেছি আমরা। বাকিরা অবশ্য আগেও এ দৃশ্য দেখেছে, কিন্তু আমার জীবনে প্রথম। তবে অনুভূতিটা বোধহয় একই থেকে যায়, যতবারই দেখা হোক না কেন। পাহাড়ের ফাঁক দিয়ে লম্বা লম্বা আলোর রেখা এসে যখন কুয়াশার চাদরকে ছিঁড়ে দেয় তখন হাত আপনা থেকেই ক্যামেরা খোঁজে। কিছু ছবি আমরাও ক্যামেরাবন্দি করেছি কিন্তু আসল দৃশ্যের সঙ্গে তার তুলনা করা মুশকিল। জলের শব্দ, পাখির ডাক আর গাড়োয়াল হিমালয়ের নিজস্ব একটা ভিজে ভিজে ধূপ ধুনো মেশান গন্ধ, এগুলোকে বন্দি করার মতন ক্ষমতা মানুষের তৈরি ক্যামেরার নেই। আর সেটাই বাঁচোয়া। নাহলে হিমালয়ের আকর্ষণও ফিকে হতে বেশিদিন লাগত না।

এখন আমরা থেমেছি একটা ছোট ধাবা ধরনের দোকানে খাওয়া দাওয়া করতে। এখানে মূলত আলুর পরোটাই চলে, নিরামিষাশী এলাকা। প্রচুর পাখি ডাকছে আশেপাশে যেটা সূর্য ওঠার পর থেকেই শুরু হয়েছে। আর দেখছি প্রচুর বাঁদর। ছোট, বড়, মাঝারি, নানান সাইজের অজস্র বাঁদর চারিদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিন্তু এখানকার মানুষের তাতে খুব একটা ভ্রক্ষেপ নেই। আমাদের এলাকায় এরকম একটা বাঁদর দেখা গেলে মানুষজন যা শুরু করে তাতে বোঝা দায় হয় কোনটা আসল বাঁদরামো। এরপর আমরা রত্নপ্রয়াগে একবার থামবো দুপুরের খাওয়া সারতে, তারপর উখিমঠ ঘুরে সোজা চোপতা। কাজেই লেখালিখি আবার চোপতায় পৌঁছে।

বিকেল ৫টা: শুরুতেই গুগোল। তুঙ্গনাথ যাওয়া হচ্ছে না। বলা ভালো যাওয়া সম্ভব হল না। অগত্যা প্ল্যানমাফিক চোপতাতে না থেকে আমরা বেশ খানিকটা নেমে এসে সিরসলি বলে একটা জায়গায় রয়েছি। এবার কেন যেতে পারলাম না সেটা বলি। উখিমঠে কেদারনাথকে পূজো দিয়ে আমরা যখন চোপতার উদ্দেশ্যে বেরোলাম তখন প্রায় দুপুর দুটো বাজে। রাস্তার অবস্থা খুব ভালো সেটা আগেই বলেছি আর অফসিজনে ট্রাফিক কম থাকায় আশা করা হয়েছিল বিকেল থাকতে থাকতেই আমরা চোপতা পৌঁছে যাব। জঙ্গলের রাস্তায় গাড়ি ঢোকার কিছুক্ষণের মধ্যেই রাস্তার ধারে ঝোপগুলোতে আর ঘাসের ওপর বরফ দেখে আমরা সবাই হৈ হৈ করে উঠেছিলাম। কিন্তু ম্যাগপাই ক্যাম্প ছেড়ে একটু দূর যেতেই ঘটল মূল বিপত্তি। চোপতা থেকে আমরা তখনও প্রায় সাত কিমি দূরে হটাৎ একটা মোড় ঘুরে আমাদের ইনোভা সজোরে ব্রেক কষে থেমে গেল। তাকিয়ে দেখি সামনে বরফে মোড়া রাস্তার ওপর নানান রকমের ছোট বড় গাড়ির একটা লাইন।

ঠিক আমাদের সামনে একটা সুমো দাঁড়িয়ে, আর সেটা যতবারই এগোতে যাচ্ছে, রাস্তার বরফের জন্যে তার চাকা স্কিড করছে। কিছু লোকজনকে আবার দেখলাম সেই ড্রাইভারকে খুব উত্তেজিতভাবে কিছু বোঝানোরও চেষ্টা করছে। আমাদের ড্রাইভার মনোজজি ব্যাপারটা দেখে গম্ভীর হয়ে বললেন যে গাড়ি নিয়ে এগোন যাবে না। তার কারণটা আমরা অবশ্য গাড়িতে বসেই বুঝতে পারছিলাম। সামনের পুরো রাস্তাটাই বরফে ঢাকা। যেখানে যে কোনও টু-হুইল ড্রাইভ গাড়িরই যাওয়া সম্ভব নয়। তখন মনোজজিই বললেন নেমে এসে কোথাও আজ রাতটা কাটিয়ে কাল এখান থেকে বাকিটা হেঁটে যেতে তুঙ্গনাথ অবধি। অর্থাৎ প্রায় চোদ্দ কিমি অতিরিক্ত আমাদের হাঁটতে হবে। বরফের মধ্যে অতটা রাস্তা হাঁটার অভিজ্ঞতা ও প্রস্তুতি আমাদের কারোরই ছিল না। তাই তুঙ্গনাথের প্ল্যান বাতিল করে আমরা কাল যাব দেওরিয়া তাল। দেওরিয়া তাল প্রায় ৮,০০০ ফুট উঁচুতে জঙ্গলে ঢাকা একটা হ্রদ যেখানে হিন্দু পুরাণমতে দেবতার স্নান করেন। এর থেকেই নাম হয়েছে দেওরিয়া তাল। একে ইন্দ্র সরোবরও বলা হয়। মহাভারত অনুযায়ী এখানেই যক্ষ ও পাণ্ডবদের প্রশ্নোত্তরপর্ব চলেছিল। কিন্তু সেটা কাল, তাই আজ আপাতত সিরসলিকেই এক্সপ্লোর করি।

রাত ১১টা: রাতের খাওয়া দাওয়া সেরে আমরা হোটেলের ঘরে বসেছি আড্ডা দিতে আর কালকের ট্রেকিং-এর রুট ঠিক করতে। এখানে রাত নামলে একা খুব একটা কেউ লোকবসতি থেকে বেশী দূরে যায় না তেন্দুয়ার (ভারতীয় লেপার্ড) ভয়ে। যদিও তেন্দুয়ার স্বাভাবিক শিকার মানুষ নয় তাও স্বেচ্ছায় লেপার্ডের সঙ্গে দেখা করতে না যাওয়াই ভাল। তাই সারা সন্ধ্যে প্রাকৃতিক দৃশ্য উপভোগ করে এখন আমরা ঘরে। কি দেখলাম সন্ধ্যাতে সেটা বলার আগে আমাদের হোটেলটার অবস্থানের একটা মোটামুটি বর্ণনা দিই। চোপতা যাবার রাস্তাটা সিরসলিতে এসে একটা 'S' এর মতন বাঁক নিয়েছে। আমাদের হোটেলটা সেই 'S' এর মাঝের দিকে, একদমই রাস্তার ওপর। হোটেল থেকে নেমে রাস্তা উপকালেই শুরু হয়েছে খাদ যেটার অনেক নিচে থেকে জলের আওয়াজ পাওয়া যায় কান পাতলেই। আর সোজা তাকালে সামনে দেখতে পাওয়া যায় তিনটে পাহাড়ের অংশ আর তার গায়ে খুঁদেখুঁদে বাড়িঘর আর চাষের জন্যে ধাপ কাটা কাটা জমি। আগেই বলেছি আজ ছিল পূর্ণিমা, তাই সন্ধ্যে সাতটা নাগাদ চাঁদ উঠল ঐ তিনটে পাহাড়ের ঠিক মাঝখান দিয়ে পুরো এলাকায় জ্যোৎস্না ছড়িয়ে। আশ্চর্য রকম শান্ত আর সুন্দর পরিবেশ এই সিরসলির। আজ সেটা আরও মোহময় করে দিয়েছিল পূর্ণিমার চাঁদ আর পাহাড়ের গায়ে জোনাকির মতন জ্বলতে থাকা বাড়ির আলোগুলো। সব মিলিয়ে এক অসাধারণ স্নিগ্ধতা। হোটেলের কাছেই একটা খোলা চাতাল মতন জায়গায় আড্ডা দিতে দিতে কখন যে সময়টা কেটে গেছে বুঝতে পারিনি কেউই। হুঁশ ফিরল রাতের খাওয়ার সময়। খাওয়াদাওয়াটা আরেক অভিজ্ঞতা। বয়স্ক বাড়িওয়ালাই রান্নার বাবস্থা করেছিলেন। বিকেল থেকেই প্রচুর উৎসাহে নিজের রান্নার গুণগান করতে শুনিছিলাম তাঁকে, কিন্তু সেটা যে এরকম কেউই বুঝিনি। বলা হয়েছিলো রুটি,ভাত,ডাল,আলু-ফুঙ্কপির তরকারি আর অমলেট তৈরি করতে। খাবার সময় যেগুলো থালায়

দেখলাম সেগুলো দেখে আর খেতে হবে ভেবে বেশ কষ্ট হল। সবথেকে অসাধারণ হল অমলেট। ওটার উপযুক্ত নাম হত ডিমের কাবাব বা ডিম পোড়া। আমাদের দলের একজন আবার দেখলাম আরও তরকারি আর ডাল চেয়ে নিয়ে রুটি মুখে দিয়ে বলে উঠল “বড়িয়া হায়”। সেই শুনে তাকে বাড়িওয়ালা ভদ্রলোক জিগ্যেস করলেন রান্না কেমন হয়েছে। উত্তরে সে বাংলাতে বলল “জঘন্য হয়েছে, ভীষণ জঘন্য”। শুনে মাথা নেড়ে ভদ্রলোক চলে গেলেন মানে না বুঝেই। যাই হোক পেট সবারই মোটামুটি ভরেছে ঐ খাবার দিয়েই। কাল দেখা যাক দেওরিয়া তালের অভিজ্ঞতা কেমন হয়।

২৬শে ডিসেম্বর, রাত ৮টা: আধ ঘণ্টা হল আমরা রুদ্রপ্রয়াগের হোটেলে এসে উঠেছি পাশাপাশি দুটো ঘরে। চোপতা যাওয়ার দিন এখানেই আমরা দুপুরের খাওয়া সেরেছিলাম। হোটেলটা মূল রুদ্রপ্রয়াগ শহর থেকে বেশ খানিকটা দূরে, হাইওয়ের ধারে, তাই সামনের রাস্তা দিয়ে যাওয়া গাড়ির আওয়াজ আর ঠিক পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া মন্দাকিনীর কুলকুল শব্দ ছাড়া বিশেষ কোনও শব্দ শুনছি না। কুলকুল বিশেষণটা লিখলাম কারণ প্রথাগত ভাবে নদীর আওয়াজ তাইই হওয়া উচিত। কিন্তু বাস্তবে আওয়াজটা সোঁ সোঁ শোনাচ্ছে। আমাদের দুটো ঘরই রাস্তা থেকে প্রায় ১২ ফুট নিচে। তাই একটু আগে নদীর শব্দ রেকর্ড করার সময় ঘরের লাগোয়া বারান্দা থেকে উঁকি মেরে দেখলাম নদীটাকে এই অন্ধকারেও আবছা একটা ধূসর আভার মতন দেখা যাচ্ছে আর ডানদিকে দূরে দেখা যাচ্ছে রুদ্রপ্রয়াগ শহরের আলো। সামনে আর বাঁদিকে তেমন বাড়িঘর নেই বোধহয় কারণ সেদিকটা অন্ধকার। এখানেও ঠাণ্ডা আছে ভালোই তবে সেটা মারাত্মক নয়। ঘরের ভেতরে থাকলে বিশেষ অসুবিধে হয় না। আর ঠাণ্ডাটা এই কদিনে আমাদের অভ্যাসও হয়ে গেছে অনেকটা।

এবার আসি আজকের ট্রেকের কথায়। আজ সারাদিন আর ডাইরি লিখিনি কারণ অনেক ভেবেও বুঝতে পারছিলাম না ঠিক কোন বিশেষণ দিয়ে দেওরিয়া তালের সৌন্দর্য ব্যাখ্যা করবো। শেষে বুঝলাম, আমার মতন শখের লেখকের এসব সাজে না। তাই নিজের মতন করে পুরোটা বলার চেষ্টা করাই ভালো। আজ আমরা সকাল আটটায় সিরসলি থেকে রওনা দিলাম সারি গ্রামের দিকে। দেওরিয়া তালের ট্রেক শুরু হয় সারি গ্রাম থেকে। গাড়ি যাওয়ার রাস্তা এখানেই শেষ। বাকি তিন কিমি পথের সবটাই ট্রেকিং। সারি গ্রাম খুব বড় গ্রাম নয়, কিন্তু খুব সুন্দর করে সাজানো। সকালে বেরনোর সময় আমরা খাওয়াদাওয়া করিনি, তাই সারি গ্রামেরই একটা ছোট দোকানে ব্রেকফাস্ট সেরে সকাল দশটা নাগাদ আমরা রওনা দিলাম এক স্থানীয় গাইডকে সঙ্গে করে। পাথরের বেশ উঁচু উঁচু সিঁড়ি ঘুরে ঘুরে উঠে গেছে পাহাড়ের কোল বেয়ে চুড়ো অবধি আর তাতে মাঝেমাঝেই বেশ কয়েকজন ট্রেকারকে দেখতে পাচ্ছিলাম পিঠে রান্না আর হাতে লাঠি নিয়ে হাঁটছে। হাঁপাতে হাঁপাতে বেশ খানিকটা ওঠার পর কানে একটা মন্ত্রপাঠের সুর শুনে ওপরে তাকিয়ে দেখি একটা মন্দিরের চুড়ো দেখা যাচ্ছে। এই এলাকার প্রায় সব মন্দিরই শিবের। তাই এটাও তার ব্যতিক্রম নয়। মন্দিরের চাতালে মিনিট পনেরো জিরোনোর পর আবার আমরা রওনা দিলাম। যতই উপরে উঠছি ততই সুন্দর হচ্ছে চারদিকের দৃশ্য। আর আমার ক্যামেরা অনবরত

সেই সব ছবি তুলে যাচ্ছে। পাহাড়ের পরিষ্কার আবহাওয়াতে ছবি ওঠেও ভীষণ ঝকঝকে, তাই সঙ্গে ক্যামেরা থাকলে ছবি তোলার লোভ সামলানো মুশকিল।



দেওরিয়া তাল ও তার পিছনে হিমালয়ের প্যানোরমা

দেওরিয়া তাল যখন পৌঁছলাম তখন হাতঘড়ি বলছে বেলা বারোটা। যদিও সময় নিয়ে মাথা ঘামানোর মতন মানসিক অবস্থা আমাদের কারোরই ছিল না। প্রায় দু'ঘণ্টা ট্রেকিংএর পর আমরা যে দৃশ্য দেখতে পেলাম তার কাছে সব কষ্ট ফিকে মনে হল। Surreal, Serene, Sublime বোধহয় একেই বলে। সারি গ্রাম থেকে যে পাথরের রাস্তা বেয়ে আমরা উঠছিলাম সেটা যেখানে শেষ সেখান থেকে শুরু হয়েছে বরফের রাজত্ব। আগের দিন চোপতার রাস্তায় আমরা যা দেখে হৈ হৈ করে উঠেছিলাম এখানে তার থেকে অনেক অনেক বেশি বরফ চারিদিকে। সেই বরফে ঢাকা জমি ঢালু হয়ে গিয়ে মিশেছে তালের সবুজ স্বচ্ছ জলে। তালের ওধারে সবুজ বনের পিছনে গাড়োয়াল হিমালয়ের সব বিখ্যাত শৃঙ্গের এক চোখ ধাঁধানো প্যানোরমা। আর সামনের সবুজ মাঠের ওপর ট্রেকারদের গোটা দশেক ছোট বড় তাঁবু। একদম পোস্টকার্ডের ছবির মতন দৃশ্য। সব মিলিয়ে আপনা হতেই মুখ থেকে বেরিয়ে এলো “বাঃ!”। সন্নিহিত ফিরতে তড়িঘড়ি ক্যামেরাখানা বাগিয়ে ছবি তুলতে যাব তখন “ভাবতে পারিস এসব ছেড়ে লোকে আল্লাস দেখতে যায়” শুনে মুখ ঘুরিয়ে দেখি আমার আরেকজন সহযাত্রী কখন পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। মোটামুটি আমরা ঘণ্টা তিনেক ছিলাম তালের আশেপাশে, তারপর আবার সারি গ্রামে নেমে এসে গাড়িতে উঠে এই খানিক আগে রুদ্রপ্রয়াগে পৌঁছেছি। এবার বোধহয় খেতে যেতে হবে। লেখালিখি তাই আবার কাল, আউলি ঘুরে এসে।

২৭শে ডিসেম্বর, সন্ধ্যা ৭টা: যোশীমঠে আমাদের হোটেলের ঘরে বসে ডাইরি লিখছি। আজ একদম অন্য রকম অভিজ্ঞতা। ঘণ্টা তিনেকের জন্যে আমরা সকলেই বোধহয় বিদেশ থেকে ঘুরে এলাম। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য অন্তত সেরকমই মানের। কালই বলেছিলাম আজ আউলি যাবার কথা। সেইমতন সকাল সাড়ে নটার মধ্যে খাওয়া-দাওয়া (মনোজজির ভাষায় “নাস্তা”) সেরে আমরা রুদ্রপ্রয়াগ থেকে রওনা হই আউলির উদ্দেশ্যে। গাড়ি নিয়ে সোজাসুজি আউলিতে যাওয়া যায় না।

হয় যোশীমঠে নেমে গাড়োয়াল মণ্ডলের বড় রোপওয়েতে অথবা গাড়িতেই আরও বেশ কিছুটা উপরে গিয়ে সেখান থেকে ছোট ছোট রোপওয়েতে করে আউলি যাওয়া যায়। আমরা প্রথমটাই বেছে নিলাম কারণ রাস্তায় যদি আগের দিনের মতই বরফ জমে থাকে তাহলে এই প্ল্যানটাও পণ্ড হবার প্রচুর সম্ভাবনা। দুপুর একটা নাগাদ আমরা যোশীমঠ পৌঁছে প্রায় সঙ্গেসঙ্গেই রওনা হই আউলির দিকে। এই রোপওয়েগুলোতে সবসুধু জনা পঁচিশ যাত্রী আর একজন অপারেটরকে নিয়ে মোট ছাব্বিশ জন এক একবার যেতে আসতে পারে এবং এই আধঘণ্টার যাত্রাপথের পুরোটাই দাঁড়িয়ে যেতে হয়। ভাড়া মাথাপিছু ৭৫০ টাকা। আউলিতে থাকার জায়গা দুটো। একটা হচ্ছে গাড়োয়াল মণ্ডলের নিজের ট্যুরিস্ট রেস্ট হাউস। আর আরেকটা বেসরকারি। নাম 'CliffTop'। কিন্তু দুটোর কোনটাতেই জায়গা না থাকায় আমরা নেমে এসে যোশীমঠে রাত কাটানোর প্ল্যান করেছিলাম। যাই হোক এবার ওপরে উঠে কি দেখলাম সেটা বলি। রোপওয়েতে যেতে যেতেই দেখেছিলাম পায়ের অনেক নীচে থাকা জমির রঙ ধীরে ধীরে সাদা হতে। আউলিতে নেমে যেকোনো তাকাই কেবল বরফ আর বরফ। আর তার মধ্যে অনেককেই দেখলাম স্কিইং বা স্লেজের মজা নিচ্ছে। আর রয়েছে মাথায় মেঘের মুকুট নিয়ে ভারতের দ্বিতীয় উচ্চতম শৃঙ্গ নন্দাদেবী। আমি যখন নন্দাদেবীর ছবি তুলতে ব্যাস্ত ততক্ষণে বাকিরা মেতেছে বরফ ছোঁড়াছুঁড়িতে। প্রায় দু'ঘণ্টা পর ওখানেই একপ্রস্থ চা খেয়ে আবার রোপওয়ে চেপে আমরা যখন নেমে এলাম তখন যোশীমঠে সন্ধ্যা নামব নামব করছে। যদিও আমার হাতঘড়ির কাঁটা পাঁচটা ছুঁই ছুঁই, তাও আলো বেশ কমে এসছে। পাহাড়ের এই এক মজা। বিকেলটা ভীষণই ছোট, আমাদের বাংলা ঋতুচক্রের হেমন্ত কালের মতন। সজাগ না থাকলে বোঝা যায় না কখন সন্ধ্যা নেমে আসে বুপ করে। আর সকালও হয় দেরীতে। আমাদের হোটেলটা রোপওয়ে স্টেশনের একদম কাছেই ঠিক করা ছিল, তাই আমরা আলো থাকতে থাকতে চেক ইন করে লাগেজ রেখেই বেরিয়ে গিয়ে খাওয়া দাওয়া করে নিয়েছিলাম। ফেরার পর এখন সবাই আড্ডার মেজাজে। কাল খিরশু, আমাদের শেষ গন্তব্য।

২৮শে ডিসেম্বর, রাত ১০টা: গাড়োয়াল হিমালয়ের কোলে আজই আমাদের শেষ রাত্রিবাস। কাল থেকে আবার সমতলে ফিরে যাওয়া। আর তারও একদিন পর থেকে রোজকার রুটিনে।



নন্দা দেবী শৃঙ্গ, আউলি থেকে তোলা ছবি

তাই হয়ত আজকের থাকার বাবস্থা অতিরিক্ত রকম ভালো। আমরা রয়েছি গাড়োয়াল মণ্ডল বিকাশ নিগমের খিরশু টুরিস্ট রেস্ট হাউসের একটা কটেজে দুটো পাশাপাশি ঘর ভাড়া করে। সবসুদু বারোটা কটেজ আর প্রত্যেকটাতেই দুটো করে ঘর। এছাড়াও একটা দোতলা বাড়িতেও ঘর ভাড়া পাওয়া যায়। আমরা ছাড়াও আরও দুটো বাঙালি পরিবার রয়েছে সেই বাড়িতে। আমাদের কটেজ থেকে তিন ধাপ সিঁড়ি নেমে একটা প্যাসেজ আর ঠিক তার পরেই লোহার তির দিয়ে ঘেরা পাঁচিল। পাঁচিলের ওপারের জমি ঢালু হয়ে নীচে নেমে গেছে খিরশু গ্রামের দিকে। একটা কংক্রিটের রাস্তাও পাঁচিলের ঠিক গা ঘেঁসে নেমে গেছে গ্রামের দিকে। আর তার দু'ধারে ছোট ছোট ঝোপের সারি যেটার ঘনত্ব ক্রমশ বাড়তে বাড়তে গিয়ে মিশেছে খিরশুর জঙ্গলে। আর সোজা নাক বরাবর তাকালে চোখে পড়ে পাহাড়ের প্যানোরমা। যার মধ্যে আমাদের পূর্ব পরিচিত চৌখান্দা ছাড়াও রয়েছে কদারনাথ, বান্দরপুঞ্জ, কামেট, নন্দাকোট ইত্যাদি। বাঁদিকের জঙ্গল শেষ হয়েছে একটা ছোট টিলাগোছের পাহাড়ে গিয়ে। আমরা যখন এখানে এসে পৌঁছই তখন এই টিলারই পিছনে সূর্যাস্তের চোখ জুড়নো রঙের কাজের সাক্ষী থেকেছি। আশা করছি কাল সকালের সূর্যোদয়ও আমাদের হতাশ করবে না। এই কটেজগুলোতে থাকার আরেকটা সুবিধে হল এখানে বিছানার সোজাসুজি একটা করে কাঁচের শার্সি দেওয়া বড় জানলা রয়েছে। যেটা দিয়ে সামনের পর্বতশ্রেণীর অনেকটাই বিছানাতে শুয়েশুয়েও দেখা যায়। ছুটি কাটানোর জন্যে আদর্শ। বাকি কেবল খিরশু থেকে সূর্যোদয় দেখা।

২৯শে ডিসেম্বর, সকাল ৯টা: Surreal, Sublime, Serene এটা আগেও একবার বলেছি দেওরিয়া তাল সম্পর্কে। কিন্তু খিরশু থেকে সূর্যোদয়ের যে ছবি আজ দেখেছি তাতে চোখ আর মন দুটোই একসঙ্গে ধাঁধিয়ে গেছে। রেস্ট হাউসের অবস্থানটা এমনই যে সূর্য ওঠে মূল বাড়ির পিছনের পাহাড়ের আড়াল থেকে। আলোর লম্বালম্বা রেখা যখন জঙ্গলের ফাঁক দিয়ে রেস্ট হাউসের সবুজ লনে এসে পড়েছে, ততক্ষণে চৌখান্দায় সোনালি রঙ লেগেছে। তারপর সেটা ছড়িয়ে পড়ল একেএকে বাকি শৃঙ্গগুলোতে। একটু পরেই গোটা হিমালয় সোনার মুকুট পরে আমাদের লেনে ধরা দিল। আর সেই সঙ্গে জঙ্গল থেকে পাখি ডাকতে শুরু করল বিভিন্ন সুরে। অসাধারণ অনুভূতি। খিরশুর জঙ্গল এমনিতেই পাখির জন্যে পরিচিত। আমরা যখন তাদের দেখা পেলাম তখন হিমালয়ের রঙ সোনালি থেকে সাদা হয়েছে কিন্তু নীচের উপত্যকা থেকে কুয়াশার চাদর তখনও সরেনি। আলো আঁধারির সেই চির পরিচিত খেলা। সূর্যোদয় দেখে আরও খানিকক্ষণ এদিক ওদিক ঘুরে আপাতত আমরা এসেছি কাছেই একটা দোকানে আমাদের ব্রেকফাস্ট সারতে। একটু পরেই খিরশু ছেড়ে রওনা দেব হরিদ্বারের দিকে। আজ আমাদের পাহাড় থেকে নামার পালা। তবে হিমালয় আমাদের মুগ্ধ করেছে প্রত্যেক পদক্ষেপে, প্রত্যেক জায়গায়। সিরসলি হোক বা দেওরিয়া তাল, আউলি হোক বা খিরশু, যোশীমঠ হোক বা উখিমঠ, প্রত্যেকটি জায়গা তার সৌন্দর্য্যে স্বতন্ত্র। তাই দ্বিতীয়বার আসা কেবল সময়ের অপেক্ষা। আর অপূর্ণতা তো একটা রয়েছেই। তুঙ্গনাথ ট্রেক...

শহরে বৃষ্টি আজ..

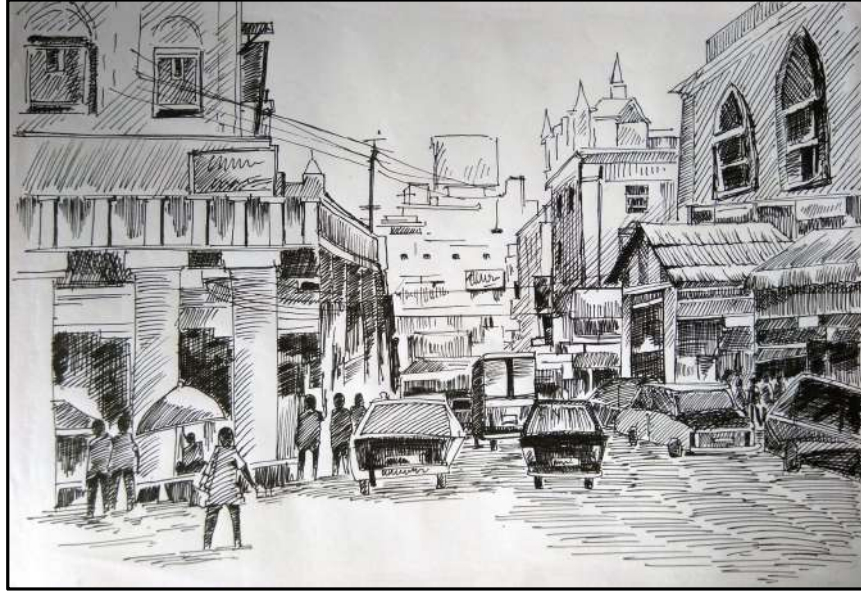
– অর্ণব চক্রবর্তী, প্রথম বর্ষ

শহরে বৃষ্টি আজ..
অস্পষ্ট আকাশের দেওয়ালে....।
আজ বৃষ্টি কলকাতায়...
শহরের জমা জলে..!
হারিকেনের মায়াবী আলো পিছনে ফেলে...
পথ হারানো পথিক ঠায় দাঁড়িয়ে..
হারিয়ে ফেলা পথ খুঁজে পেতে।।
আজ বৃষ্টি এলো,
নীল আকাশের হাসিমুখ
বিমুখ হলো...!
স্বপ্নরা কল্পনায় ফিরে গেলো..
ভোরের স্বপ্ন সত্যি হলো...!
একসময় বৃষ্টির ছোঁয়ায় স্বপ্নরা চলে গেলো....
রেখে গেলো শৈশব স্মৃতিগুলো।।

ভিক্ষু মা

– উৎপল চন্দ্র দাস*, প্রাক্তন ছাত্র

কতগুলো মা'কে, কেউ দেখার নেই
শুধু কত পথ দেখে তাদের,
বয়স্কমনে ক্ষোভ জমে, ঘৃণা জমে
কিন্তু সমাজ দাঁড়িয়ে আপন মনে,
অসুস্থ সময়ে কে ফেলে যায় যত্রতত্র
যেভাবে নোংরা ফেলে পৌরসভার ভ্যানে,
হয়তো নিজের কেউ,
যার ব্যবহারে এসেছিল অথবা
যাকে সৃষ্টি করে ভুগতে হচ্ছে
এই পৃথিবী, বিশাল মানুষের ঢেউ।



– চিরন্তন সিনহা, দ্বিতীয় বর্ষ

মা

– সায়ক ঘোষ, প্রথম বর্ষ

আমাদের এলাকায় বিল্টুদা খুবই পরিচিত মুখ। জুতো সেলাই থেকে চন্ডীপাঠ সর্বত্রই তার উজ্জ্বল উপস্থিতি লক্ষ্যণীয়। সে এক কারখানায় শ্রমিকের কাজ করে। কাজের সময়টুকু বাদ দিয়ে তাকে সবসময় মানুষের উপকারে দেখা যায়। অসময়ে মানুষের পাশে দাঁড়ানো তার মহৎ গুণ। অবশ্য এ গুণ সে তার পরম মমতাময়ী মায়ের কাছ থেকেই পেয়েছে। তার মাকে আমরা কালামাসি বলেই চিনি। তিনি নামে কালা হলেও কাজে কিন্তু নন। তাঁকেও সময়ে অসময়ে মানুষের উপকারেই পাওয়া যায়। কখনো তিনি বৃদ্ধ বা অন্ধ ব্যক্তিকে অথবা স্কুলের বাচ্চাদের অতি যত্নে রাস্তা পার করিয়ে দিচ্ছেন, আবার কখনো কলেরা রোগীর সেবা করছেন। তাঁর নিজের বাড়িতেও কয়েকটা অনাথ বাচ্চা থাকে, তিনিই তাদের দেখাশোনা করেন। এই হল বিল্টুদা আর কালামাসির নিত্য জীবনযাপন। দিন আনি দিন খায় করে দিব্যি চলে যায়। একদিন বিল্টু কারখানায় কাজ করছে এমন সময় তাদের পাড়ারই এক ছেলে তপন এসে তাকে খবর দিল যে কালামাসিকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এক অন্ধ মানুষ রাস্তা পার হতে গিয়ে গাড়ির সামনে পড়ে যায়। আর তাকে বাঁচাতে গিয়ে কালামাসি গাড়িতে ধাক্কা খেয়েছেন। যদিও গাড়ির ড্রাইভার প্রাণপণে ব্রেক কষেছিল তবুও অ্যাক্সিডেন্ট এড়াতে পারেনি। মাসির প্রচণ্ড আঘাত লেগেছে, অনেক রক্ত বেরিয়ে গেছে। বিল্টুর চোখ নিমেষে ঝাপসা হয়ে

এলো। এক অজানা ভয় তাকে গ্রাস করলো। সে তখনি দৌড়ে গেল হাসপাতালের দিকে।

ডাঃ সৌনক মিত্র বেরিয়ে এলেন অপারেশন থিয়েটার থেকে। একরাশ উৎকণ্ঠা, আশঙ্কা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা জনতা তাঁর কাছে জানতে চাইলো মাসি কেমন আছেন। সৌনকবাবু তাঁর অতি পরিচিত সুমধুর হাসিটি দিয়ে জানালেন এযাত্রায় তিনি কালামাসিকে বাঁচাতে পেরেছেন। বিল্টু ঈশ্বরকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানালো। তপন জিজ্ঞাসা করলো, “কিন্তু ডাক্তারবাবু, রক্ত কোথায় পেলেন?” ডাঃ মিত্র বললেন, “একজন ব্লাড ডোনারকে পাওয়া গেছিলো যে যেকোনো মূল্যে ওনার জীবন বাঁচাতে চেয়েছিলো”। সবাই উৎসুক হয়ে জিজ্ঞাসা করলো, “কে সেই ব্যক্তি?” ডাক্তারবাবু নির্বিকার চিন্তে জবাব দিলেন, “ডাঃ সৌনক মিত্র”। এবার আর বিল্টু নিজেকে ধরে রাখতে পারলো না, সোজা ডাক্তারবাবুর পায়ে ধরে বলতে লাগলো, “আপনি আমার ভগবান, আপনি আমার মায়ের জীবন দান করেছেন”। সৌনকবাবু তাকে তুলে নিয়ে বললেন, “বিল্টু, তোমার মা যে কেমন মানুষ তা আমি জানি, মানুষের ভালো বই মন্দ, করা তো দূরের কথা, চিন্তাও করেন না। উনি চলে গেলে মানুষের ভালোর জন্য ভাবার একটা মানুষ কমে যেত। তাছাড়া উনি তো তোমার একার মা নন, বেশ কিছু কচিকাঁচারও মা। আর শিশু বয়সে মাতৃহারা হবার যন্ত্রণা যে কী তা আমি জানি। তাই এই ছোটো ছোটো ভাইবোনেরা যাতে মাতৃস্নেহ থেকে বঞ্চিত না হয়, তার জন্য আমি সর্বশক্তি দিয়ে চেষ্টা করেছি”। কথাগুলো বলতে বলতে ডাক্তারবাবুর চোখের কোণ দুটো চিকচিক করে উঠল।

"ভালো আছি ভালো থেকো"

(স্বরচিত গান)

– অরিত্র বিশ্বাস, দ্বিতীয় বর্ষ

[VERSE 1]

আমি তোমার আকাশ ছুঁয়ে এসেছি,
তুমি পারনি আমায় ধরতে।
আমি তোমার হৃদয়ে লিখেছি,
তুমি পারনি আমায় বুঝতে।।

তাই আজ স্বপ্নগুলো, শেষ হয়ে গেলো।
নিজে করেছো ছারখার, চুরমার।

[CHORUS]

ভালো আছি ভালো থেকো,
ভুলে থেকো সারাজীবন।
ভালো আছি ভালো থেকো,
নতুন করে আবার স্বপ্ন দেখো,
আবার..।

[VERSE 2]

কলেজের লাইব্রেরীতে, হারানো সেই স্মৃতিতে,
আজ গভীরভাবে ভেসে যায়।
স্টেশনের ওভারব্রীজ, অচেনা মানুষের ভিড়,
ছিল ভালবাসার দুনিয়া।

ভালোবাসার স্মৃতিগুলো, আজ হারিয়ে গেলো।
তাই শান্ত মনে ভেসে যায়, অজানায়।

[CHORUS]

ভালো আছি ভালো থেকো,
ভুলে থেকো সারাজীবন।
ভালো আছি ভালো থেকো,
নতুন করে আবার স্বপ্ন দেখো,
আবার ..।

[TRANSPOSE]

তাই আজ স্বপ্নগুলো, শেষ হয়ে গেলো।
চোখ খুলে দেখি আর নেই, কিছু নেই।

ভালো আছি ভালো থেকো,
ভুলে থেকো সারাজীবন।
ভালো আছি ভালো থেকো,
নতুন করে আবার স্বপ্ন দেখো ...।।
আবার ..।

(বিষয়ভিত্তি: বিরহবিচ্ছেদ)

মাত্রা: 8/8

স্বপ্ন না সত্যি

– দুর্লভ দত্ত, দ্বিতীয় বর্ষ

পরীক্ষা শেষ হতেই তাকে ছুটতে হচ্ছে। তাকে বলতে সুমনকে। আজ তার উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার শেষ দিন। রসায়ন পরীক্ষা ছিল আজ। স্কুলের একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণিতে রসায়নের প্রতি অধিক ঝোঁক না থাকা সত্ত্বেও ৭০-এর উপর নম্বর পেয়েছে প্রতিবারে। আজও পরীক্ষা খুব যে মধ্যমানের হয়েছে তা নয়। এদিকে নেমেছে মুশলধারে বৃষ্টি। বালির নৈঃ প্লাটফর্মে ভিড়টাও বেড়েছে। দ্রুত টিকিট নিয়ে সুমন চলে আসে শেডের তলায়। ঘড়িতে বাজে দুটো পঁচিশ মিনিট। গাড়ি আসতে এখনও দেরি পঁয়ত্রিশ মিনিট। যদিও কর্ডের ট্রেন বলে তা চল্লিশ-পঞ্চাশ মিনিটেও ঠেকতে পারে। মেন লাইন দিয়ে হুস হুস করে ব্যান্ডেল লোকাল আর মেমারি লোকাল চলে যায়। বৃষ্টির ধারা থামতে চায়না। সুমন পড়ে বালি জোড়া-অশখতলা বিদ্যালয়ে। স্কুলের টপার ছেলে বরাবর সুমন। খেলাধূলাতেও প্রচণ্ড ঝোঁক তার। উচ্চমাধ্যমিক চললেও খেলাধূলাতে বিরাম নেই। বিকাল ৪টা মানেই মাঠে। সুমনদের সিট পড়েছে বালি শিক্ষানিকেতন স্কুলে। বালি স্টেশন থেকে ১৫ মিনিট লাগে পায়ে হেঁটে। উচ্চমাধ্যমিকের শেষ দিন বন্ধুরা কোলাকুলি করে এখনও বৃষ্টিতে ভিজছে। স্কুলজীবনের সীমারেখা টানার পরের মুহূর্তটা সবাই আবেগে ভরাচ্ছে। কিন্তু সুমনের প্রবল ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও বন্ধুদের সাথে আজ তার আনন্দ শেয়ার করা হচ্ছেনা।

সুমনের বাবা-মা থাকেন বর্ধমানে। ছেলে বালির ডিংসাই পাড়ায় থাকে কাকু-কাকিমার কাছে। সেখান থেকেই একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির পড়াশোনা করেছে। বালি শহরটাকে আপন করে নিতে তার বেশি সময় লাগেনি। টিউশন, আড্ডা, হাইলুপ্পোড় সব নিয়ে পড়াশোনা করেছে। ইচ্ছা ছিল এখানে থেকেই কলেজে ভর্তি হবে। কিন্তু তা আর হলনা। আসলে সুমনের বাবা মশাগ্রাম থানার একজন দায়িত্ববান পুলিশ অফিসার। ৩ মাস ধরে কোমায় পড়েছিল। আজ সকাল বেলায় তার অন্তরাত্মা পার্থিব দেহ ছেড়ে বেরিয়ে গেছে। আজকেই ৯টার সময় খবরটা কানে এসেছে সুমনের। ১০টা থেকে ছিল পরীক্ষা। মায়ের নির্দেশ পরীক্ষা দিয়ে তবেই যেন এখানে আসে। কাকুর ভীষণ জ্বর এদিকে। তাই কাকিমা বলেছিল – “যা বাবা দেখে শুনে যাস।” ১৮ বছরের ছেলেটির এহেন পিতৃবিয়োগের দুঃখটা সবাই বোঝে। সুমন কিন্তু পাথরের মতো শক্ত হয়েই রয়েছে। তার চোখ মুখ লাল হয়ে উঠলেও, চোখে নেই একফোঁটা অশ্রুবিন্দু। বন্ধুদের কাছেও সে খবরটা দেয়নি। তার প্রিয় বন্ধুগণ কৃষ্ণেন্দু, স্বরাজ, অমিত আজ তাকে পিছু ডাকলেও হল থেকে আগে বেরিয়ে রওনা দিয়েছে।

ঘড়িতে সময় দুটো-চল্লিশ। ভিড় আরও বেড়েছে। পেয়ারাওয়ালা বৃষ্টির গতি কম দেখে ঝাঁকা তুলে একটু এগিয়ে যাওয়ার উপক্রম করে। কুকুরগুলো চুপচাপ বসে আছে ফাঁকা ডাউন চার প্লাটফর্মে। তারাও যেন সুমনের সমব্যথী। সুমনের মনে পড়তে থাকে বাবার সাথে কাটানো

দিনগুলির কথা। এখানে আসার সময় বাবার কাছ থেকে শোনা অ্যাডভাইসগুলির কথা। এখানে কাটানো দিনগুলির কথা। পুলিশ হওয়ার জন্য সুমনের বাবা ছেলেকে খুব বেশি সময় দিতে পারতেন না। কিন্তু স্নেহের পরিমাণও মায়ের থেকে কিছু কম ছিল না। এখানের ঘটনাগুলো বাবাকে আগে জানাত সুমন। থানায় থাকাকালীন ফোন করার জন্য অনেকবার বকুনিও খেয়েছে সে। এখানের বন্ধুদের নাম বাবার যেন মুখস্থ ছিল। এছাড়াও বান্ধবীদের কথাও জানিয়েছিল সুমন। তার মধ্যে প্রিয়াঙ্কা নামক মেয়েটি সুমনের অধিক ঘনিষ্ঠ। এমন ভাবতে ভাবতে হুস করে রাঁচি-ইনটারসিটি এক্সপ্রেস পাশ করে যায়। সুমনের যেন তন্দ্রাভঙ্গ হয়।

তিনমাস আগে সুমনের টেস্ট পরীক্ষার সময় সুমনের বাবা আশিস বাবু একটি কেসের ব্যাপারে তদন্ত করতে বর্ধমান যান। সেখানে বিখ্যাত ১০৮ শিবমন্দিরে গিয়ে বিশেষ এমন কিছু তথ্য পান যার মাধ্যমে তিনি অনায়াসেই প্রদত্ত কেসের অপরাধীদের কাছে পৌঁছাতে পারতেন। আসলে পূজোর সময় মশাগ্রামে একসাথে পাঁচজন মার্ডার হয়। তারই তদন্তের দায়ভার ছিল আশিস বাবুর ওপর। ক্লু পাওয়ার পরের সপ্তাহে বিকাল বেলায় থানার বাইরে তাকে লক্ষ্য করে ৩টি গুলি চালায় কেউ। দুটি গুলি মিস করলেও তিন নম্বরটি লাগে মাথার পিছনে। লুটিয়ে পড়েন উনি ওইখানেই। অন্যান্য অফিসাররা তাকে স্থানীয় নার্সিংহোমে নিয়ে যান। ডাক্তার বলেন ওই গুলি বার করতে গেলে ওনার প্রাণহানি হতে পারে; এই কথায় সুমনের মা অপারেশনে বাধা দেন। সুমন বাবাকে দেখতে আসে পরের দিন ভোরে। আশিস বাবুর তখনও টনটনে জ্ঞান। ছেলেকে এমনভাবে ব্রেনওয়াশ করেন যে সে ওখানে থেকে বাবার ওপর কর্তব্য পালনের কথা ভুলেই যায়। ও ওখান থেকে চলে গেলে উনি কোমায় গভীর নিদ্রায় চলে যান।

এই কথাই ভাবছিল সুমন। এমন সময় খবর হল কর্ডলাইন বর্ধমান লোকাল আপ কর্ড ৫ নং প্ল্যাটফর্মে আসছে। যাত্রীরা যে যার মতো স্থানে চলে যাওয়ার উপক্রম করে। বৃষ্টি আর পড়ছে না। সুমন এবার দ্রুতপদে প্ল্যাটফর্মের প্রথম দিকে এগোয়। গাড়ি ঢুকছে। ভিতরটা একদম ফাঁকা। গেটের ছেলেগুলো পরীক্ষা শেষের আনন্দে মেতে রয়েছে। শিস্ দিচ্ছে জোরে জোরে। সুমন ভিতরে গিয়ে একটা সিট দখল করে নেয়। গাড়ি চলতে থাকে।

হাসপাতাল থেকে মৃতদেহ যাবে পোস্টমর্টেম হতে। তাই সুমনের দায়িত্ব পালনের জন্য তাকে তাড়াতাড়ি পৌঁছাতে হবে। গাড়ি বারুইপাড়া ছাড়িয়ে গেছে। এখন গাড়ির গতি অনেকটা কমে গেছে। হয়তো হলুদ সিগন্যালের জন্য। কর্ডলাইনে এক্সপ্রেস পাশ হয় দিনে অনেকগুলো করে। তাই লোকাল গাড়িগুলোকে সাইড লাইনে ঠেলে দূরপাল্লার গাড়িগুলোকে আগে জায়গা করে দেওয়া হয়। ঘড়িতে সময় তিনটে বেজে সাতাশ মিনিট। সুমনের চোখ লেগে যায়। স্বাভাবিকভাবেই বৃষ্টিতে একটু ভিজে গেলে অনেকেরই হয়ে থাকে এটা।

গাড়ি চন্দনপুর স্টেশনে অনেকক্ষণ দাঁড়ায়। হঠাৎ সুমনকে কেউ যেন বলতে থাকে - 'নেমে যা!' 'নেমে যা!' সুমন তাড়াতাড়ি চোখ মেলে তাকায়। দেখে কম্পার্টমেন্ট পুরো ফাঁকা। কোণার দিকে এক ভদ্রলোক খাঁকি পোশাক পরে বসে আছেন। কথাটা যেন তিনিই বলছেন - 'নেমে যা!'

‘নেমে যা!’ সুমন একটু বেশিই অবাক চোখে চারপাশটা দেখে নেয়। আর ভাবতে থাকে যে বাকি সবাই গেল কোথায়। আস্তে আস্তে সে উঠে ওই ভদ্রলোকের কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। ব্যক্তির ইউনিফর্ম দেখেই সে চিনতে পারে; এই পোশাক তার অতিপরিচিত। কিন্তু বলতে কিছুই পারেনা। তার গলার স্বর যেন কেউ বেঁধে দিয়েছে। ভদ্রলোকের মুখ দেখার আগেই ওই ভদ্রলোক হঠাৎ করে উধাও হয়ে যায়। ঘুম ভেঙে যায় হঠাৎ করে। ঘড়িতে দেখে চারটে বাজে। খতমত করে উঠে পড়ে সিট থেকে। গাড়িতে দেখে আগের মতই ভিড়। একটু বেড়েছে সামান্য।

গাড়িটা কোনো একটা স্টেশনে ঢুকছে। সুমন তাড়াতাড়ি ব্যাগ হাতে গেটের সামনে চলে যায়। গাড়ি থামলে নেমে দেখে স্টেশনের নাম ধনিয়াখালি হল্ট। এখান থেকে বর্ধমান বেশি দূরে নয়। বারো-তেরোটা স্টেশন মাত্র। স্টেশনের বাইরে এসে একটি যাত্রী প্রতীক্ষালয়ে সুমন একটু বিশ্রাম নেয়। চোখে মুখে জল ছেটায়। তারপর উত্তরবঙ্গগামী একটি বাসে উঠে পড়ে ও বর্ধমানের টিকিট করিয়ে নেয়। বাসে উঠে তার ট্রেনের দেখা দিবা-স্বপ্নের কথা বারবার মনে পড়ে। সেটা স্বপ্ন না সত্যি বুঝতে পারেনা।

ঘণ্টাখানেক পরে বাস বর্ধমানে ঢোকে। সুমন নেমে সেখান থেকে অটো ধরে সোজা চলে যায় হাসপাতালে। এখন তার চোখে একফোঁটাও জল নেই। পুলিশকর্মীরা তাকে সমবেদনা জানায়। কিন্তু সুমনের সেই স্বপ্নের কথাই বারবার মাথায় ঘুরতে থাকে।

সন্ধ্যের সময় সুমন বাড়িতে ফিরলে মা তাকে জড়িয়ে কাঁদতে থাকে। কিন্তু এ কান্নার কারণ সম্পূর্ণ বিপরীত। মা তাকে জিজ্ঞেস করে – ‘তুই কিভাবে পারলি?’ সুমন বুঝতে না পারায় মা তাকে টিভির দিকে ঠেলে দেখতে বলে। আত্মীয় স্বজনরাও তাকে বলে – ‘তুই জানিসনা?’ ‘কিভাবে হল’ ইত্যাদি। টিভিতে তখন সব চ্যানেলে একটাই নিউজ বর্ধমানের আগের স্টেশন গাংপুরে আপ বর্ধমান লোকাল ও শান্তিনিকেতন এক্সপ্রেসের মুখোমুখি সংঘর্ষ। ডাউন শান্তিনিকেতন এক্সপ্রেস সিগন্যাল গাফিলতির কারণে ও লাইন ক্রসিং ভুল থাকায় ২নং লাইনে চলে আসে এবং আপ বর্ধমান লোকালের সাথে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। হাজারেরও বেশি মানুষ নিহত হয়েছে এবং আহতদের অবস্থাও গুরুতর। বগি কেটে লাশ বার করা হচ্ছে। ট্রেন চলাচল আপাতত বিপর্যস্ত।

সুমন এবার বুঝতে পেরে যায় ওই ব্যক্তি যে তার স্বপ্নে এসেছিল আসলে কে এবং কেন তাকে নেমে যেতে বলেছিল। একবার গাটা শিউরে উঠে তার, পরক্ষণেই চোখের কোনায় একফোঁটা অশ্রুবিন্দুর আবির্ভাব হয়।

সভ্যতা

– শুভদীপ দে, প্রথম বর্ষ

শেষ সেই কবে দেখেছিলাম, আলোকিত হয়েছে
চারদিক
চাঁদের আলোয়,
আজ তো খালি দেখি কৃত্রিম আলোয়
ইট-পাথরের চরম আত্ননাদ।।
কবে সেই শোনা ঝাঁঝি পোকাকার ডাক
আর আজ গাড়ির আওয়াজে মনে হয় কেউ
কানে বাজাচ্ছে ঢাক।
সেই নির্মল বাতাস, কবে গ্রহণ করেছিলাম তাও
আজ মনে পড়ে না।।
হে সভ্যতা!!
তুমি উন্নত হয়ে সব সৌন্দর্য থেকে
করলে বঞ্চিত আমায়?
এই সৌন্দর্যকে পাওয়ার অফুরন্ত ইচ্ছা
মনের মাঝে ছুটে বেড়ায়
তাই যাই গ্রামে।।
সেখানেও কলকারখানার ধোঁয়ায় ব্যর্থ হয়,
আমার আশা।
তাই মনের দুঃখে ফিরে আসি শহরে!!
ঠিক করি কাটাব এ জীবন
নূতন সভ্যতার তরে,
এভাবেই কেটে যায় দিন
পূর্ণ হয় না আশা।।
তবে আমি জানি এ আশা মিথ্যা নয়;
ধ্বংসের তরেই সৃষ্টি হবে নূতন
এবং সেদিনই আমি আবার
ফিরে পাব প্রাণ।
এই বলে বিদায় নিই
নূতন সভ্যতায় আমি জন্মাবই।।

সিটি কলেজ

– সৌভিক খামরুই, প্রথম বর্ষ

সিটি কলেজ তুমি
তোমারে জানাই প্রণাম।
১৮৮১-তে জন্ম নিয়ে
এখনো রয়েছ আমাদের মাঝে
তোমার কাছে শিক্ষা নিয়ে
কত সন্তানেরা পেয়েছে সুনাম।
সিটি কলেজ তুমি
তুমি রয়েছ কলকাতার মাঝে,
তোমায় ঘিরে মোদের আলো
মোদের মনে আছে সর্বক্ষণে।
সিটি কলেজ তুমি
তোমার সামনে দিয়ে চলে গেছে
আমহাস্ট স্ট্রিট
শত শত গাড়ি ঘোড়া চলেছে রোজ ছুটে।
সিটি কলেজ তুমি
তোমার মধ্যে পেয়েছি আমি
টিনা, শিলু, সুস্মিতা-র
মতো বেশ ভালো বান্ধবী।
শীর্ষেন্দু, সায়ক, রাজদীপ, শুভদীপ,
সৌভিক, ছোটু, রনিত, রাজু, অর্ণব, দত্ত
সহ অনেক বন্ধুকে।
তোমায় ছেড়ে যেতে চায় নাকো মন,
সবার সেরা মোদের কাছে তুমি মায়ে মতন
আশীর্বাদ করো মোদের যেন মানুষ হতে পারি
হৃদয় মাঝে থাকবে তুমি
মোদের সবার জীবনভরে।

Schrodinger's Cat

– দেবব্রত দেব*, প্রাক্তন অতিথি অধ্যাপক



ছবির ঋণ: সৌরভ রায়চৌধুরি

আজকাল সুখেনের বউয়ের ঘুম খুব পাতলা হয়েছে। অনেক সময় ঘুম আসতে আসতেই রাত পেরিয়ে হয় ভোর। জানে লোকটা ফিরবে না তবু রাতে খুঁট করে শব্দ হলে সে তড়িঘড়ি উঠে বসে কান পাতে। সে জানে সুখেন আর নেই, তবু হয়ত এই মিথ্যের বৃত্তেই তার সারাটা জীবন কেটে যাবে। হয়ে উঠবে অভ্যেস। আসলে না দেখা সত্যিগুলোর থেকে প্লাস্টিক মিথ্যেগুলো অনেক সময় ঢের ভালো। পদার্থবিদ্যায় এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কোয়ান্টাম মেকানিক্স। সেই কোয়ান্টাম মেকানিক্সের এক বিখ্যাত ধাঁধা হল Schrodinger's Cat। আমি আমার মত করে ব্যাপারটা বোঝাই। ধরা যাক আমি একটা বাক্সে একটা বেড়াল ও বিষ দেওয়া খাবার একসাথে রেখে দিলাম। এবার বাক্স বন্ধ করে মাপতে বসলে বেড়ালের বেঁচে থাকার সম্ভাবনা ৫০-৫০। অর্থাৎ কোয়ান্টাম মেকানিক্সের ভাষায় বেড়ালটা একই সাথে জীবিত ও মৃত, যার পোশাকি নাম কোয়ান্টাম সুপারপজিশন। এই অনিশ্চিত ধারণা ভাঙবে আমরা বাক্সটা খুলে দেখলে তবেই। এটাকে বলে কোয়ান্টাম ইনডিটারমিনেন্সি অর্থাৎ the observation or measurement itself affects an outcome, so that the outcome as such does not exist unless the measurement is made। ঠিক যেভাবে আমাদের পাশের পাড়ার বিদেশে থাকা সায়নের বাবা মারা যাওয়ার পরেও জরুরী তলবে সায়নের ঘরে ফেরা না পর্যন্ত তার কাছে থাকেন জীবিতই। যেভাবে মেঘার চোখে তার ঠান্মা আজও জীবিত, তার মৃত্যুশয্যা মেঘা দেখতে না চাওয়ায় বা তার শেষযাত্রার ছবি দেখতে অস্বীকার করায়। সে মেনেই নিতে পারেনি যে তার প্রিয় ঠান্মা আর নেই।

তাই তিনি আজও মেঘার কাছে বেঁচে, তার অনুপস্থিতি সে চোখ বুজলেই ঘুচিয়ে ফেলতে পারে। না, মেঘার স্কিৎজফ্রেনিয়া নেই। যে কোন প্রিয় মানুষের অনুপস্থিতিই একটা দীর্ঘ অভ্যেসের বিচ্ছেদ। আমরা আস্তে আস্তে নিজেদের বোঝাই, প্রতিনিয়ত অনুশীলন করি সেই অনুপস্থিতির বিশ্বাসের দিকে। তবে ভেবে দেখলে এটাও সম্ভব যে যাকে তুমি ঘৃণা কর তার উপস্থিতি স্বত্তেও আসলে সে তোমার কাছে মৃত, আবার ভালোলাগার মানুষের মৃত্যুও পারে না তাকে সহজে তোমার জীবন থেকে উপড়ে ফেলতে। যেভাবে গত সপ্তাহে পাওয়া ফেরারি সুখেনের মৃত্যুর খবরে এত দিনের যাপনের রীতি পাল্টাল ঠিকই কিন্তু সুখেনের বউয়ের বিশ্বাস আর পাল্টালো না। সে হয়ত তার স্বামীর মৃত্যুকে ফেরার ভেবেই কাটিয়ে দেবে জীবন। আমার দাদু বলতেন যে, হোয়াইট লাই জীবনকে ভালো করলে জীবনে সেই হোয়াইট লাই বেঁচে থাকুক। ওই মিথ্যে আর সত্যি আসলে the observation or measurement itself affects an outcome বা এককথায় perception।

কে জানে কত মিথ্যে হয়ত সারাজীবন বুকে সত্যি চেপে কাটিয়ে দেয়। আর আমাদের জানা কত সত্যি আসলে মিথ্যে হয়েও খুজে নেয় জীবন। তাই হে জীবন তোমার যাপনে চিরন্তন সত্য খুঁজতে যাওয়া বাতুলতা।

মুখ্য

– অচ্যুত কুমার চক্রবর্তী, প্রাক্তন অধ্যাপক

যেমনি সত্য
সূর্য্য নামক নক্ষত্রটি আছেই
এই বিরাট মহাশূন্যে,
আর অবিরাম উত্তাপ বর্ষণে
আলো বিকিরণে
বাঁচিয়ে রেখেছে
আমার এই ধরিত্রীকে,
যেমনি সত্য
গ্রীষ্মের পর
বর্ষা আসবেই,
অথবা বৃহস্পতি
গ্রহসমূহের মধ্যে
বৃহত্তম,
বা
কিছুই গ্রহণ না করে
বেঁচে থাকা অসম্ভব,
অথবা যেমনি সত্য –
বিশ্বচরাচরে
সব কিছুই মধ্যস্থ
একটা অদৃশ্য নিগূঢ়
টান রয়েছে অন্যের জন্যে,
ঠিক তেমনি সত্য
ফেলে আসা বছরে
অচেনাদের এক গুচ্ছকে
চেনার পর
এক নিবিড়
মধুর সম্পর্ক
গড়ে ওঠে

এই পঞ্চভূতকে সাক্ষী রেখে,
এবং যার
পরবর্তী সৌর বর্ষগুলোতে
সে বন্ধন
বর্ধিত হয়ে
দ্বি-গুনিত ত্রিগুনিত হয়েছে।
জীবন নাট্যের
এক এক অধ্যায়ে
বহু শত গীত
গাঁথা হয়ে চলেছে,
আর রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত
দর্শকদের মধ্যে
কিছু বিশিষ্টজনের
ভাবালুতার পরিসংখ্যান
নেয়া যাচ্ছে না,
শুধুমাত্র এই কারণে যে
আন্তরিকতা এই অংশে
তরঙ্গায়িত হয়ে
গতিকে শুধুই
ত্বরাস্থিত করেছে,
যা আশা-প্রত্যাশার
হিসেব কষে না
স্বার্থপরতার দোহাই দেয় না,
নিষ্পাপ নিরবচ্ছিন্ন
স্বচ্ছ ও নির্মল সৌন্দর্য্যই
শুধু সত্য,
নাট্যাঙ্কে
সততা ও গভীরতাই
এখানে মুখ্য।

The Integral Quantum Hall Effect [IQHE]

– Dr. Amiya Bhushan Biswas, Ex. Professor

"Where the telescope ends, the microscope begins"

- Victor Hugo.

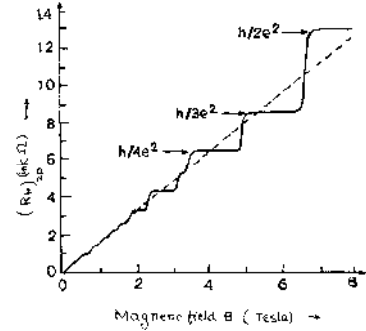
1. Introduction

Physics (Science, in general) is a splendid edifice with latest brick almost always laid on an earlier one. Physics of the phenomenon that I am going to discuss here is a wonderful wattle of the classical concept of the well-known *Hall Effect*, modern technology of two dimensional [2D] system of conduction electrons and the quantum mechanics of *Landau-levels*. This phenomenon is known as *Quantum Hall Effect* [QHE] or more precisely the *Integral Quantum Hall Effect* [IQHE] (the reason of this naming will be understood very soon). This effect manifests itself spectacularly as a series of plateaus of the quantized values of Hall resistance[†] R_H of materials containing 2D electron system as depicted in Fig.1. These values are given by,

$$(R_H)_{2D} = \left(\frac{h}{e^2}\right) \frac{1}{r} = \frac{25813}{r} \Omega, \quad r = 1, 2, 3, \dots \quad (1)$$

where, h is the Planck's constant ($h=6.62607 \times 10^{-34}$ J-S), e is the elementary electronic charge ($e=1.60217 \times 10^{-19}$ C) and the symbol Ω stands for the unit of resistance Ohm. To date this simple result has been found to be correct to within a few parts in 10^9 . This has led to adopt the quantized Hall resistance as the *international standard* of resistance. Since in (1), r is an integer, this observation is named, as stated above, the Integral Quantum Hall Effect, IQHE.

The original discovery of this striking and surprising result (by Klitzing, Dorda and Peper^[1] in 1980) was made with a MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field Effect) in which the electrons are confined to the plane interface (which really means three dimensional [3D] system but extremely thin $\sim 100\text{\AA}$) between the semiconductor (usually, Silicon) and oxide layer grown on top of it. For this discovery von Klitzing was awarded Nobel Prize in Physics in 1985^[2].



2. Classical Hall Effect and definition of Hall Resistance

Before proceeding further, a few introductory comments are here. It is well known that a transverse emf appears when a current carrying conductor (not necessarily a metal) is placed in a magnetic field \vec{B} that acts perpendicular to the direction of current flow. This, as we know, is called the *Hall Effect*.

Fig.1 Quantized Hall resistance $(R_H)_{2D}$ of a typical 2D electron system as a function of magnetic field strength B (in Tesla) at low temperature $T \sim \text{mK}$. The dotted line is the classical result.

[†] Here we use the symbol 'RH' to denote 'Hall resistance' not the Hall-coefficient which is commonly denoted by the same symbol. Readers must not confuse one with the other. In fact, for the rectangular geometry of the specimen (thin slab) as shown in Fig. 2, Hall coefficient = Hall resistance $\times \frac{\text{Thickness}(b)}{\text{Field strength}(B)}$

The transverse emf is called the *Hall-voltage*, and is denoted by V_H . For simplicity, we take the shape of the conductor, as displayed in Fig. 2, in the form of a long thin flat slab of width w and thickness b .

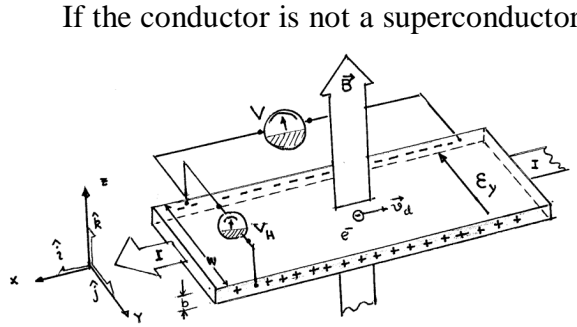


Fig. 2. Schematic representation of the geometry for measurement of hall-voltage. The unit vectors represent the usual *unit-triad* used in a rectangular cartesian coordinate system. Specimen conductor is taken in the shape of a rectangular thin slab of width w and thickness b . The symbols i , v , v_H denote respectively the current flowing through the conductor, voltage drop across the length and transverse hall voltage v_H . Magnetic field B is applied along the z -axis perpendicular to the direction (x -axis) of current flow and v_d is the drift velocity of an electron. [here we assume only electrons as charge carriers for conduction process]

If the conductor is not a superconductor there is a voltage drop V along the direction (x -axis) of the flow of current I . The ratio V/I is just the usual resistance R ($=V/I$). Under normal condition (in absence of external magnetic field) no such voltage drop occurs along the transverse direction (y -axis) of current flow (why?) However, if a magnetic field \vec{B} is applied perpendicular to the direction of current flow (*i.e.*, parallel to the thin dimension (z -axis) of the slab [Fig.2]. Lorentz force [Being the drift velocity of a conducting electron (of charge $-e$)] comes into play and it pushes the electrons to bunch up on one of the thin side of the slab and a positive ion excess (mainly) is established on the opposite side. This, in turn, produces an electric field \mathcal{E}_y and therefore a voltage drop between the thin faces. This is the Hall voltage, $V_H = \mathcal{E}_y w$. Under steady state condition (when force due to electric field \mathcal{E}_y precisely balances the Lorentz force acting on the electrons in motion), the Hall

resistance, R_H is given (by definition) the ratio V_H / I which yields the formula,

$$(R_H)_{3D} = [V_H / I] = B / n_v b e \quad (2)$$

where n_v is the volume density of electrons.

- The simplicity of experimental setup for Hall-effect makes the Hall resistance R_H (or Hall coefficient $= R_H \frac{b}{B}$) one of the most frequently measured quantities.

Taking the view that a 2D-electron system is really a thin 3D one in which all motion of the charge carriers is practically restricted in a 2D-plane in question (but not along the perpendicular direction to that plane) we can define the 2D surface-density, $n_s = n_v b$ and obtain the 2D classical formula for the Hall resistance in the form,

$$(R_H)_{2D} = \frac{B}{n_s e} \quad (3)$$

3. Quantum mechanical treatment of 2D-electron system and Landau-levels

Let us now consider the quantum mechanical treatment for 2D-electron system [as shown in Fig.2]. As assumed, the electrons are confined in the x - y plane and magnetic field $\vec{B} = B \hat{k}$ is applied along the z -axis. In this situation, the Hamiltonian (operator) of the 2D-electron system becomes [in S.I units],

$$\hat{H} = \frac{(\hat{p} + e\hat{A})^2}{2m} ; [\hat{p} = -i\hbar \vec{\nabla}_2 \text{ with } \vec{\nabla}_2 = \hat{i} \frac{\partial}{\partial x} + \hat{j} \frac{\partial}{\partial y}] \quad (4)$$

where m is the electron mass and \vec{p} is the canonical momentum (not mechanical momentum) and \vec{A} is the vector potential associated with the magnetic field \vec{B} by the relation $\vec{B} = \vec{\nabla} \times \vec{A}$, [curl of \vec{A}]. In presence of strong magnetic field ($B \sim$ several Tesla), since Coulomb potential plays no significant role we use for convenience, the Landau gauge in the form $\vec{\nabla} \cdot \vec{A} = 0$ [ignoring scalar Coulomb potential] which can be satisfied (equally well) both by the choice of $\vec{A} = xB\hat{j}$ and $\vec{A} = -yB\hat{i}$. We use here the first one[#],

$$\vec{A} = xB\hat{j} \quad (5)$$

Schrödinger (time-independent) wave equation (or the eigenvalue equation) in two dimension (x-y space), $\hat{H}\psi(x, y) = E\psi(x, y)$ now takes the form,

$$-\frac{\hbar^2}{2m}[\vec{\nabla}_2^2 - \frac{e^2}{\hbar^2}\vec{A}^2 + \frac{ie}{\hbar}(\vec{\nabla}_2 \cdot \vec{A} + \vec{A} \cdot \vec{\nabla}_2)]\psi(x, y) = E\psi(x, y) \quad (6)$$

where, as defined already, $\vec{\nabla}_2 = \hat{i}\frac{\partial}{\partial x} + \hat{j}\frac{\partial}{\partial y}$. Use of (5) then dictates

$$(\vec{\nabla}_2 \cdot \vec{A})\psi(x, y) = xB\frac{\partial\psi}{\partial y} \quad (7a)$$

$$(\vec{A} \cdot \vec{\nabla}_2)\psi(x, y) = xB\frac{\partial\psi}{\partial y} \quad (7b)$$

$$\text{Hence, } \frac{ie}{\hbar}(\vec{A} \cdot \vec{\nabla}_2 + \vec{\nabla}_2 \cdot \vec{A})\psi(x, y) = \frac{ie}{\hbar}2xB\frac{\partial\psi}{\partial y} \quad (8)$$

Plugging this result in the left side of (6), we obtain

$$[\frac{\partial^2}{\partial x^2} + (\frac{\partial}{\partial y} + \frac{iexB}{\hbar})^2 + \frac{2mE}{\hbar^2}]\psi(x, y) = 0 \quad (9)$$

Since the coordinate, y does not appear in the Hamiltonian [as it appears in the left side of the eigen-value equation (6) and, as we know, the commutators $[\hat{x}, \hat{p}_y] = 0$, $[\hat{p}_x, \hat{p}_y] = 0$, the momentum operator \hat{p}_y commutes with the Hamiltonian: $[\hat{p}_y, \hat{H}] = 0$.

This implies that corresponding wave number $k_y = \frac{p_y}{\hbar}$ is a *good quantum number* and can be regarded as a constant parameter of electron motion. The corresponding wave function can therefore be taken as purely translational type $\sim e^{ik_y y}$. Thus the simultaneous eigen-functions $\psi(x, y)$ both for \hat{H} and \hat{p}_y are of the form,

$$\psi(x, y) = e^{ik_y y} u(x) \quad (10)$$

The wave function $u(x)$ now satisfies the Schrödinger equation,

$$[-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2}{dx^2} + \frac{1}{2}m\omega_c^2(x - \frac{\hbar k_y}{m\omega_c})^2]u(x) = Eu(x) \quad (11)$$

$$\text{where, } \omega_c = \frac{eB}{m} \quad (12)$$

is the *cyclotron frequency*^{*}. We note that the quantity $\frac{\hbar k_y}{m\omega_c}$ has the dimension of length and is a constant (since k_y , as argued above, is a constant), we can put this quantity as x_0

[#] The choice : $\vec{A} = -yB\hat{i}$ will lead us to obtain the same result [see, for example, Eq. (13')]

(i.e., $x_0 = \frac{\hbar k_y}{m\omega_c} = \frac{\hbar k_y}{eB}$). This allows us to rewrite the wave equation (11) in the form[§]

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} + \frac{1}{2} m\omega_c^2 (x - x_0)^2\right] u(x) = E u(x) \quad (13)$$

▪ Landau levels

The Eq. (13) resembles the Schrödinger equation for a linear (one dimensional) harmonic oscillator with centre of oscillation at $x = x_0$ [instead of $x=0$]. Hence, by analogy to the case of linear harmonic oscillator, we can take the quantized energies of the *cyclotron motion** of a 2D-electron as

$$E_n = \left(n + \frac{1}{2}\right) \hbar\omega_c; \quad n = 0, 1, 2, \dots \quad (14)$$

It is important to note that the discrete eigenvalues E_n , as given by (14), are independent of the parameter k_y and, therefore, are highly degenerate [see below]. This result is remarkable. The presence of strong transverse magnetic field causes a great condensation of continuous spectrum of energy of a 2D quasi-free electron into a discrete set of highly degenerate levels of a 1D fictitious simple harmonic oscillator. These levels are called *Landau levels*. The levels are equally spaced by cyclotron energy $\hbar\omega_c$ which is proportional to the strength of the applied field ($\omega_c = \frac{eB}{m}$). The gap between the levels is void of electronic states.

The family of states belonging to the ground level (zero point energy with $n=0$) are extended in y -direction but are Gaussian,

$$\psi_0(x) = C e^{-\frac{\alpha^2}{2}(x-x_0)^2}; [\alpha = \sqrt{\frac{m\omega_c}{\hbar}} = \sqrt{\frac{eB}{\hbar}}, C = \text{normalisation constant}] \quad (15)$$

For a given value of k_y , the Gaussian wave ψ_0 is centred at $x = x_0$ with a width (root mean square deviation or *standard deviation*) $l_m = \frac{1}{\alpha} = \sqrt{\frac{\hbar}{eB}}$, called the magnetic length.

▪ Degeneracy of Landau levels

The most important aspect of Landau levels is there degeneracy. Since Landau levels, as remarked already, are independent of k_y , one may think of any arbitrary value of k_y for a given level E_n . However this is not true because of the relation $x_0 = \frac{\hbar k_y}{m\omega_c} = \frac{\hbar k_y}{eB}$ [as used in Eq. (13)]. For a given x we must have $0 \leq x_0 \leq w$ where w is the width of the 2D sample. This is simply because the centre of oscillation cannot be outside the sample-geometry. Thus for finding the allowed values of k_y we use *box normalization* with usual *periodic condition*. As we know, for a rectangular region: $0 \leq x \leq L_x$, $0 \leq y \leq L_y$, the

* Under the applied uniform magnetic field $\vec{B} = B\hat{k}$, perpendicular to the plane of motion (x - y plane), an electron (while in motion) always experiences a sideways force (transverse to the direction of velocity) and moves in a circular path in the x - y plane., with frequency $\omega_c = \frac{\text{velocity}}{\text{radius}} = \frac{eB}{m}$. This, as we know, is the *cyclotron-motion* and the frequency ω_c is called the *cyclotron frequency*.

§ If one would start with the second choice for vector potential \vec{A} namely, $\vec{A} = -yB\hat{i}$, the wave equation (13) would

read as $\left[-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dy^2} + \frac{1}{2} m\omega_c^2 (y - y_0)^2\right] u(y) = E u(y) \quad \dots (13')$

periodic condition in y-direction demands

$$\psi(x, y=0) = \psi(x, y=L_y) \quad (16)$$

which dictates that $e^{ik_y L_y} = 1$ or,

$$k_y = \frac{2\pi}{L_y} j; \quad j = 0, 1, 2, \dots \quad (17)$$

Because of inter-relation of k_y and x_0 , there must be a maximum value of j for a given value of B say, $J = j_{\max}$. Then

$$\frac{2\pi}{L_y} J = \frac{eB}{\hbar} L_x \rightarrow J = \frac{eB}{\hbar} \frac{L_x L_y}{2\pi} \quad (18)$$

which gives the measure of the total number of allowed states corresponding to a Landau-level E_n ; $n=0, 1, 2, \dots$ in the available sample area. This gives the degeneracy (number of states per unit area in 2D available space) of a Landau level,

$$g_L = \frac{eB}{h} \quad (19)$$

This result plays the crucial role for exhibition of IQHE, as illustrated below.

4. Theoretical Prediction for quantized values of R_H

Let a large number (N) of electrons are moving in the 2D-space available in the specimen. If temperature T is sufficiently low ($\sim 0K$), all these electrons will occupy the lowest possible energy levels. However, according to Pauli-exclusion principle no single state can be occupied by more than one electron [Here *Spin-degree of freedom* is ignored: see concluding remarks]. Hence the maximum number of electrons per unit area that can be accommodated in the lowest Landau-level $E_0 = \frac{1}{2} \hbar \omega_c$ is just equal to $g_L = \frac{eB}{h}$ which (one must note) depends linearly on the field strength B . It reveals that at temperature say, $T \sim 0K$, the energy (Fermi-energy) at which the last electron can be accommodated into the lowest Landau-level depends upon the field strength B . Thus, keeping temperature fixed, with the increase of B , more and more electrons can be accommodated in the lowest Landau-level when Fermi-level falls on it. Suppose the surface density (n_s) of electrons in a given sample is fixed. Now, by adjusting the field strength, let all these electrons be accommodated into exactly r number of Landau-levels. Since each level can hold the same number (g_L) of electrons

$$r = \frac{n_s}{g_L} \rightarrow n_s = g_L r = \frac{eB}{h} r; \quad r = 1, 2, \dots \quad (20)$$

Recalling the definition of $(R_H)_{2D}$ given by (3), we find, under the special condition (20),

$$(R_H)_{2D} = \frac{B}{n_s e} = \frac{h}{e^2} \left(\frac{1}{r} \right), \quad r = 1, 2, \dots \quad (21)$$

This is precisely the observed quantized values of the Hall resistance for a 2D-system as given by the formula (1). Experimentally, this result is found to be quite independent of the purity of the sample.

5. Concluding Remarks

The integral quantum Hall effect [IQHE], as studied above, is one of the most surprising and striking phenomena in the quantum-world that has been discovered during last 40 years or so. Its intimate connection with Landau levels is firmly established. Filling of an exact integral number of Landau levels produces the correct quantized values of Hall resistance for 2D-system observed with high magnetic field at low temperature ($\sim mK$).

In our simplified discussion we have not included the spin-degeneracy. Electron is a spin-1/2 particle with two projections (parallel to \vec{B}) $m_s = \pm \frac{1}{2}$. If spin-degeneracy is removed (Zeeman splitting in a strong magnetic field $B > 3T$), each Landau level becomes a doublet and at the same time degeneracy of Landau-levels will also be doubled. So, if the spin-degeneracy is removed, both odd and even plateaus of $(R_H)_{2D}$ will appear with the change of the field strength B . However, if Zeeman splitting is not removed (because of high temperature and/or low field strength) then only even plateaus will appear with

$$(R_H)_{2D} = \frac{h}{e^2} \left(\frac{1}{2r} \right); r = 1, 2, \dots. \text{ Practically, magneto-conductivity scenario for 2D electron}$$

system lies between these two extreme limits. Since Zeeman splitting is linear in B [Hamiltonian, $\hat{H}_{\text{Zeeman}} = \vec{\mu}_{\text{atom}} \bullet \vec{B}$] one can resolve the spin-degeneracy only at large magnetic field ($B > 3T$) as pointed out earlier. This indeed is depicted in Fig. 1. While the values $(R_H)_{2D} = \frac{h}{3e^2}, \frac{h}{4e^2}$ are clearly seen for $B > 3.5T$, the value $(R_H)_{2D} = \frac{h}{5e^2}$ shows only a shoulder for $B \approx 3.5T$. Below $B < 3T$ all plateaus are even (not shown very distinctly).

To this end, we mention an important observation that deserves attention. When $(R_H)_{2D}$ is at one of the plateaus (quantized values), the voltage drop V along the direction of current flow in the specimen drops to vanishingly small values showing almost insignificant values of ordinary resistance (R) of the sample. The reason is very simple: If certain lower most r levels are completely filled up corresponding to a plateau of $(R_H)_{2D} = (h/e^2)/r$, the only way for energy to be dissipated (the effect of resistivity) is by exciting the electrons to higher level E_{r+1} which is separated by an energy gap $\hbar\omega_c$. In between these levels there is no electronic state. At a very low temperature ($T \approx 0K$ or mK) there is simply not enough thermal energy ($k_B T$; k_B =Boltzmann const.) to bridge the energy gap.

Soon after the discovery of IQHE, fractional quantum Hall effect [FQHE] is also observed [3]. These new plateaus are seen only with the best samples (least imperfection) at generally higher magnetic field and lower temperatures (nearly absolute zero). It is now understood that FQHE results from the mutual Coulomb interactions between the electrons. These interactions create new gaps in the energy spectrum resulting the lowest Landau levels filled up only partially ($1/3^{\text{rd}}$, $2/3^{\text{rd}}$, $2/5^{\text{th}}$ etc.).

▪ Articles consulted

- [1] K. von Klitzing, G. Dorda and M. Peper : Phys. Rev. Lett. 45 494-497 (1980)
- [2] K. von Klitzing (Quantized Hall Effect) : Rev. Mod. Phys. 58 519-531 (1986). This is von Klitzing's Nobel lecture.
- [3] D. C. Tusi, H. L. Stromer, A. C. Gossard : Phys. Rev. Lett 48 1559-1562 (1982)
- [4] B. I Halperin: "The Quantized Hall Effect": Sci. Am. 254 52-60 (1986)
- [5] B. N Taylor: "New measurement standards": Physics Today 42 23-26 (1989)
- [6] J. P Eisenstein and H. L Stromer: "The fractional quantum Hall effect": Science 248 1510-1516 (1990)

কয়েকটি সংখ্যার আখ্যান ও কুসংস্কার

– অনিরুদ্ধ রায়, প্রাক্তন অধ্যাপক

বিজ্ঞানের বিভিন্ন আবিষ্কারের ফলে মানুষের মধ্যে অনেক অন্ধকার কেটে গেছে। তবু কুসংস্কার মানুষকে কিছুতেই ছাড়ছে না। বরং বলা ভালো মানুষ যেন কুসংস্কার ছাড়তে চাইছে না। কিছু কিছু সংখ্যার সঙ্গে কিছু আখ্যান জড়িয়ে আছে এবং তার সঙ্গে কুসংস্কারও।

মানুষ কবে থেকে গুনতে (counting) শিখল, সেটি নির্ণয় করা খুবই শক্ত। তবে 1960 খৃষ্টাব্দে আফ্রিকার কঙ্গোর Ishango অঞ্চলে 20 হাজার বছরের পুরানো একটি বেবুনের হাড়ের খন্ড আবিষ্কৃত হয়েছে। এই হাড়টি Ishango Bone নামে পরিচিত। এটি Royal Belgian Institute of Natural Sciences – এ সংরক্ষিত আছে। এই হাড়ের ওপর সুসম সংখ্যায় ও ভাগে ভাগে রেখা কাটা হয়েছিলো। পুরাতত্ত্ববিদদের ধারণা কোন কিছু গণনা বা মিলিয়ে (tally) দেখার জন্য এই রেখাগুলি কাটা হয়েছিলো।

পুরাকালে নগর সভ্যতা গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে গণনা ও সংখ্যার (number) প্রয়োজনীয়তা অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে এবং সংখ্যাকে প্রকাশ করা ও সংরক্ষণ করা বা লিখে রাখা খুবই জরুরী ছিলো। খৃষ্টপূর্ব 4000 বছর আগে সুমেরীয়দের মধ্যে, খৃষ্টপূর্ব 3000 বছর আগে মিশরীয়দের বা খৃষ্টপূর্ব 300 আগে ব্যাবলীয়নদের মধ্যে গণনা ও সংখ্যার প্রচলন ছিলো। কিন্তু তারা প্রত্যেক সংখ্যার জন্য (number) এক একটি নির্দিষ্ট চিহ্ন বা ছবি বা সংকেত সংরক্ষণ করেছিলো। অর্থাৎ সবই সংখ্যা (number), অঙ্ক (digit) বলে কিছু ছিলো না। সুতরাং স্থানভিত্তিক (positional) সংখ্যার প্রকাশ ছিলো না, তবে ব্যাবলীয়নরা ছিল স্বতন্ত্র। ব্যাবলীয়ন সভ্যতায় প্রথম স্থানভিত্তিক সংখ্যার ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু বর্তমান শূন্য বলতে আমরা যা বুঝি তার ব্যবহার ছিল না। তারা 1 থেকে 10 অবধি প্রকাশের জন্য আলাদা আলাদা চিহ্ন ব্যবহার করতো। পরে সংখ্যাগুলি স্থানভিত্তিক নিয়মে প্রকাশ করতো। যেমন 11 লিখতে একটি 10-এর চিহ্ন, তার ডানদিকে একের চিহ্ন। তেমনি 35 সংখ্যা বোঝাতে 3টি পরপর 10-এর চিহ্ন, তারপর ডানদিকে 5-এর চিহ্ন, ইত্যাদি।

পুরানো সভ্যতায় শূন্যের ব্যবহার ছিলো না, একথা বলা যাবে না। তবে তার প্রকাশ ও অর্থ ছিলো অন্যরকম। শূন্যের ব্যবহার প্রথম লক্ষ্য করা যায় সুমেরীয় সভ্যতায়। তবে সেটি ঠিক সংখ্যা হিসাবে নয় বা ‘কিছুই নয়’ বোঝাতেও না। তারা কতগুলো দশ বা শত বোঝাতে ব্যবহার করত। প্রথমদিকে ব্যাবলীয় গণিতবিদদের মধ্যে sexagesimal (base 60) পদ্ধতি খুব প্রচলিত ছিল। দুটো sexagesimal সংখ্যার মধ্যে কোন সংখ্যার অনুপস্থিতিকে ফাঁক দিয়ে বোঝাতেন (শূন্য)। খৃষ্টপূর্ব 1770 প্রাচীন মিশরে সংখ্যাগুলি স্থানভিত্তিক (positional) না হয়ে চিত্রভিত্তিক ছিল। তাদের চিত্রে একটি প্রতীক থাকতো, যাকে নেফার (nfr) বলা হ’ত (অর্থ সুন্দর), সেটি তারা

মন্দির বা পিরামিডের অঙ্কনে base level (অর্থাৎ শূন্য level) হিসাবে সূচিত করত। তার সাপেক্ষে দূরত্ব ওপরে বা নিচে মাপা হোত। ভারতবর্ষে খৃষ্টপূর্ব 300 বছর আগে পিঙ্গলা Binary Number-কে মর্স কোডের ন্যায় (ডট ও ড্যাশ) ব্যবহার করেছেন, এবং তার সঙ্গে সংস্কৃত শব্দ ‘শূন্য’ ব্যবহার করেছেন। পঞ্চম শতকে আর্যভট্ট প্রথম আধুনিক স্থানভিত্তিক দশমিক (decimal base place value) পদ্ধতি ব্যবহার করেন।

বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে ‘শূন্য’ (Zero) ব্যাপারটি বিভিন্ন ভাবে এসেছে ঠিকই, কিন্তু গণিত শাস্ত্রে ‘শূন্য’কে একীভূত কিভাবে করা যায় বা সরাসরি প্রয়োগ করা যায় এ বিষয়ে তেমন কোন ধারণা তাদের মধ্যে দেখা যায়নি। সপ্তম শতকে ব্রহ্মগুপ্ত প্রথম শূন্য (Zero) -কে সংখ্যা হিসাবে প্রয়োগ করেছেন। শূন্যের যোগ বিয়োগ ইত্যাদি কি হবে তাও তিনি দেখিয়েছেন। তার ফলে স্থানভিত্তিক দশমিক পদ্ধতি সংখ্যা প্রকাশের পথ সুগম হ’য়ে গেল এবং গণিত শাস্ত্রে একটি বিরাট বিপ্লব ঘটে গেল। ‘শূন্য’ অর্থ কিছুই নয়, আবার শূন্য একটি অঙ্ক ও সংখ্যা এই দ্বৈত অর্থ প্রথমদিকে অনেকেই মেনে নিতে পারেনি। ইউরোপীয়দেরও বহুদিন সময় লেগেছিলো।

1200 খৃষ্টাব্দ নাগাদ ইটালীয় গণিতবিদ Fibonacci ইউরোপে শূন্যসহ আরবিক সংখ্যার প্রচলনে উদ্যোগী হন। ইটালীয় ব্যবসাদার ও জার্মানীর ব্যাঙ্কারা খুবই শীঘ্রই এই প্রথা গ্রহণ করেন, কিন্তু ইউরোপের অনেক দেশ রোমন পদ্ধতি থেকে বেরিয়ে আসতে চাননি এবং সেইসব দেশের সরকার নতুন পদ্ধতি নিষিদ্ধ করেন। যদিও গোপনে ব্যবসায়ীরা নতুন পদ্ধতি ব্যবহার করত। পরবর্তীকালে ছাপাখানা আবিষ্কৃত হওয়ার পর আরবিক পদ্ধতি ত্বরান্বিত হয়। যতদূর জানা যায় ইংরাজিতে ‘Zero’ শব্দটি প্রথম ব্যবহৃত হয় 1598 খৃষ্টাব্দে। এটি ইটালীয় শব্দ ‘Zefiro’ থেকে আসে। আবার ‘Zefiro’ শব্দটি আসে পূর্ব ইসলামিক সময়ের আরবী শব্দ ‘Sirf’ থেকে যার অর্থ ‘কিছুই নাই’ (empty)।

যদিও ভারতবর্ষে আধুনিক স্থানভিত্তিক দশমিক পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয় কিন্তু ইউরোপীয়রা ভাবত এটি আরবদের আবিষ্কার। আসলে আরবদের মাধ্যমে এই পদ্ধতি ইউরোপে প্রবেশ করে। তাই তারা এর নামকরণ করেন আরবিক পদ্ধতি। বর্তমানে যদিও এটি সংস্কার করে নতুন নামকরণ হয়েছে হিন্দু আরবিক পদ্ধতি।

40-এর ইংরেজি বানান কি হবে – FORTY না FORTY? এই ধন্দ শুধু আমাদের মধ্যে নয় গ্রামীণ ইংরেজদের মধ্যেও দেখা যায়। এর অন্যতম কারণ হোল, অনেকেই মনে করেন ‘FOUR’ থেকে FORTY এসেছে। আসলে FORTY শব্দটি FOUR থেকে আসেনি। পুরানো ইংরেজি ভাষায় ‘FEOWERTIG’ শব্দটি এসেছে ‘FEOWER’ শব্দ থেকে যার অর্থ FOUR এবং ‘TIG’-এর অর্থ দশের সমষ্টি। ‘FEOWER’ এবং ‘FEOWERTIG’ রূপান্তরিত হয়ে যথাক্রমে FOUR এবং FORTY হয়েছে।

100-কে ইংরেজিতে HUNDRED বলে। কিন্তু নবম থেকে 13 শতাব্দীতে OLD NORSE-এ HUNDRED বলতে দুটি ভিন্ন সংখ্যাকে বোঝাত। একটি ‘Five Scores

Hundred' (যেটি 100) এবং অন্যটি 'Six Scores Hundred' (যেটি 120) (Score অর্থ 20)। ইংরেজি ভাষায় যখন এটি যোগ হয় তখন ধন্দ কাটাতে Five Scores Hundred-কে (100) 'New Hundred' বা Short Hundred বা Decimal Hundred এবং Six Scores Hundred (120)-কে Old Hundred বা Long Hundred বা Duodecimal Hundred বলা হতো। পরবর্তীকালে Six Scores Hundred পরিত্যাগ করা হয় ও Five Scores Hundred-কে রাখা হয় এবং শুধু HUNDRED হিসাবে পরিচিতি লাভ করে।

এক সময় সারা পৃথিবী জুড়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ছড়িয়ে পড়ে। একটা কথা চালু ছিল যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কখনও সূর্যাস্ত হয় না। ইউরোপের অন্য কয়েকটি দেশ, যেমন, ফ্রান্স, পর্তুগাল দেশেরও অনেক উপনিবেশ ছিলো। ইউরোপীয়রা প্রায় সবাই ছিল খৃষ্টধর্মী। তাদের জীবনযাত্রার প্রভাব ঐ সব উপনিবেশ দেশগুলির জনগণের মধ্যেও সঞ্চারিত হয়েছিল এবং তার অনেক অংশ এখনও বর্তমান। ভাল সংস্কারের সঙ্গে কুসংস্কারও দেশে দেশে ছড়িয়ে পড়ে। একটি প্রচলিত কুসংস্কার জড়িয়ে রয়েছে 13 সংখ্যার সঙ্গে। যেটি আমাদের ভিন্নধর্মী মানুষদের অনেকেই বিশ্বাস করেন। এখানে সেইরকম কুসংস্কারযুক্ত সংখ্যা সম্বন্ধে আলোচনা করব।

666, প্রথম দর্শনেই বলা যায়, এটি একটি Palindromic সংখ্যা অর্থাৎ বামদিক থেকে ডানদিকে বা ডানদিক থেকে বামদিকে পড়লে সংখ্যাটি একই থাকে। গণিতশাস্ত্রের দৃষ্টিতে দেখলে এটি 1 থেকে 36 অবধি পরপর সংখ্যাগুলির যোগফল। আবার প্রথম সাতটি মৌলিক সংখ্যার বর্গের যোগফল $2^2 + 3^2 + 5^2 + 7^2 + 11^2 + 13^2 + 17^2 = 666$, এটি আবার Triangular Number। Triangular Number হচ্ছে সেই সংখ্যা যে সংখ্যার dot বা circle দিয়ে সমবাহু ত্রিভুজ তৈরী করা যাবে। অর্থাৎ প্রতি বাহুতে সমসংখ্যক dot বা circle থাকবে এবং ত্রিভুজটির ভেতরেও dot থাকবে। যেমন 3 . ওপরে একটি তলায় 2টি দিয়ে সমবাহু ত্রিভুজ করা যাবে। তেমনি 6 . ওপরে একটি তার তলায় দুটি তার তলায় তিনটি মোট 6টি, এরপরের Triangular Number হোল 10, ইত্যাদি। এটি আবার Simith Number। Simith Number হোল যে সংখ্যার (number) অঙ্কগুলির (digit) যোগফল ঐ সংখ্যার মৌলিক উৎপাদকের অঙ্কগুলির যোগফলের সমান। যেমন $22 \rightarrow 2 + 2 = 4$ আবার 22-এর উৎপাদক 2×11 এবং অঙ্কগুলি 2,1,1 এবং $2 + 1 + 1 = 4$ ।

এছাড়া আরও অনেক কিছু আছে কিন্তু এখানে সেটা প্রধান আলোচ্য নয়। এই সংখ্যার সঙ্গে একটি কুসংস্কার জড়িয়ে আছে। পৃথিবীতে যারা নিজেদের খুব সভ্য বলে গর্ব করেন সেই আমেরিকার প্রেসিডেন্টও এর থেকে মুক্ত ছিলেন না। তাঁর বাড়ি যখন Los Angeles-এর 666 St. Cloud Road-এ স্থানান্তরিত করার ব্যবস্থা হয়, তিনি রাজি হননি। পরে ঐ বাড়ীর নম্বর 667 করা হয় তারপর তিনি ওখানে বসবাস করেন। Intel Processor Pentium 3-র 666MHz বদলে 667 MHz করা হয় এই কুসংস্কারের জন্যই। এই রকম উদাহরণ ঝড়িঝুড়ি। এই সংখ্যাটিকে 'Number of Beast' বলে। কিন্তু এর উৎপত্তি কোথা থেকে? New Testament-এ

Book of Revelation, chapter 13-এ এর উল্লেখ আছে, “Let the one with understanding recon (Recon শব্দটি Greek এর অর্থ Calculate বা Solve) meaning of the number of the beast, for it is the number of a man. His number 666...”। শয়তান সেইসব মানুষ যাদের মধ্যে 666 রয়েছে। পুরাকালে হিব্রুতে বিভিন্ন সংখ্যাকে তাদের বর্ণমালার বিভিন্ন বর্ণ দিয়ে বোঝানো হ’তো। সম্রাট নিরো। হিব্রুতে Nron Qsr [উচ্চারণ Neron Kaisar]। হিব্রু, আরবী বা উর্দুর মতো ডানদিক থেকে বামদিকে লেখা হয়। এখানে বোঝানোর সুবিধার জন্য বামদিক থেকে ডানদিকে লেখা হলো। N হিব্রু বর্ণ NUM; সংখ্যা বোঝানো হয় 50+ তেমনি R(Rush)200+ O(Vav)6+ N(Num)50+ Q(Qoph)100+ S(Samesh)60+ R(Resh)200 = 666. নিরোর চরিত্রের সঙ্গে Beast বা Devil-এর মিল আছে সুতরাং আর কি! মানুষ যে কোনভাবেই হোক এই সংখ্যাটিকেই Devil ভাবতে শুরু করলো। মনে রাখতে হবে কুসংস্কার কুসংস্কারই।

Harvey Dubner বিশাল অঙ্কের কয়েকটি মৌলিক সংখ্যা আবিষ্কার করেন তার মধ্যে সবচেয়ে ছোটটি এই রকম 1,000,000,000,000,066,600,000,000,000,001 । অর্থাৎ প্রথমে 1 তারপর 13টি শূন্য তারপর তিনটি 6 তারপর 13টি শূন্য এবং শেষে 1 । এটি একটি Palindromic Number [অর্থাৎ বামদিক থেকে ডানদিকে যা ডানদিক থেকে বামদিকে পড়লেও একই]। তিনি অনুভব করেন আরও মৌলিক সংখ্যা বার করা যায় যদি 16661এর মতো Palindromic Prime Number এর মধ্যে 13, 42, 506, 608, 2472 ও 2623 সংখ্যক শূন্য 1 এবং 666 এবং 666 এবং 1 এর মধ্যে বসানো যায়। কিন্তু কুসংস্কার যাবে কোথায় ? প্রথম যে মৌলিক সংখ্যাটি উল্লেখ করলাম সেটি 31 অঙ্কের, 31 কে ওল্টালে 1, আবার 13টি করে দুদিকে শূন্য রয়েছে, আবার মাঝে রয়েছে Number of Beast 666, সোনায়ে সোহাগা। গণিতবিদ Cliff Pickover এর নামকরণ করেন Belphegor’s Prime । নরকের সাত রাজপুত্রের একজনের নাম Belphegor ।

14 শতাব্দীতে ইংরেজী ভাষায় ‘million’ শব্দটি যুক্ত হয়। এই শব্দটি Old French-এর million, ইটালীয় ‘millione’ (great thousand) ও ল্যাটিন ‘mille’ শব্দের রূপান্তরিত রূপ। এর পূর্বে ইংরেজদের ‘Thousand’-ই ছিলো সবচেয়ে বড় সংখ্যার ইংরেজি নাম। Thousand কে আগে বলা হ’ত ‘pusend’ যার অর্থ Strong hundred । যতদিন million শব্দটি ইংরেজি শব্দ ভাঙারে আসেনি ততদিন million সংখ্যাটি ছিল ‘pusend pusend’ (thousand thousand)।

বর্তমানে ‘billion’ বলতে আমরা বুঝি 1-এর পর 9টি শূন্য। অর্থাৎ হাজার million। কয়েক দশক আগেও billion-এর দ্বৈত অর্থ ছিলো। আমেরিকানরা billion বলতে thousand million কে বোঝাত কিন্তু ইংরেজরা billion বলতে million million কে বোঝাত। তেমনি আমেরিকানরা trillion বলতে million million (1-এর পর 12টি শূন্য), ইংরেজরা million million

million (1-এরপর 18টি শূন্য) বোঝাত। যাই হোক 1974-এ ইংরেজরা আমেরিকানদের million ও trillion-এর সংজ্ঞা মেনে নেয়।

আমেরিকান গণিতশাস্ত্রবিদ Edword Kasner একটি বৃহৎ সংখ্যা 1-এর পর 100টি শূন্য বসালে যেটি হয় তার নাম কি দেওয়া যায় সে বিষয়ে ভাবতে ভাবতে তার 9 বছরের ভাইপো Sirotta-কে উদ্দেশ্যহীনভাবে প্রশ্নটা করেছিলেন। ভাইপো মুখে একটা শব্দ করল 'googol'। Edword-এর খুব পছন্দ হয়ে গেল। 1920 সালে তিনি ঐ সংখ্যার নাম করেন googol এরপর তিনি আর একটি সংখ্যার নামকরণ করেন তার নাম googolplex। এই সংখ্যাটি হোল 1-এরপর googol সংখ্যক শূন্য বসালে যা হয়।

আজ Search engine 'Google'-এর নাম কে না জানে। 1996 সালে এর নাম ছিলো Back Rub। 1997-এ এর প্রতিষ্ঠাতা Larry Page ও Sergey Brain, Back Rub-এর নতুন নামকরণে মনস্ত্রি করেন এবং এ ব্যাপারে অন্য বন্ধুদের সাহায্য চাইলেন। তাদের অন্যতম সহপাঠী বন্ধু Sean Anderson পরামর্শ দিল Googolplex। কিন্তু Lorry-এর পছন্দ হোল Googol। Sean খুজতে লাগলো internet domain-এ Googol বলে কোন নাম রেজিষ্টার্ড আছে কিনা। কিন্তু ভুল করে Googol টাইপ করার বদলে Google type করলো এবং দেখলো Google নাম কেউ রেজিষ্টার করেনি। Lorry-র ঐ ভুল বানান Google-ই পছন্দ হয়ে গেল। Back Rub-এর নাম পরিবর্তিত হয়ে Google হলো এবং সেই সঙ্গে তাদের Headquarter-এর নাম tongue-in-check পরিবর্তিত হয়ে নতুন নাম হোল Google Plex।

এরকম অনেক কাহিনী জড়িয়ে আছে কিছু সংখ্যার সঙ্গে। এই লেখাটি কৌতূহল জাগিয়ে তোলার জন্য। কারও মধ্যে যদি কৌতূহল জাগ্রত হয় তবে লেখাটি সার্থক হয়েছে বলে মনে করবো।

ধন্দ পুরাণ

– ডঃ অমিতাভ পাল, প্রাক্তন অধ্যাপক

মস্তিষ্ক বিকৃতির তারতম্য অনুসারে ঈশ্বরসৃষ্ট শ্রেষ্ঠ জৈব পদার্থ অর্থাৎ মনুষ্যকুলকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায় – পাগল, নিস্পাগল (নিঃ + পাগল) এবং অর্ধপাগল। প্রখ্যাত আড্ডাধারী সৈয়দ মুজতবা আলি তাঁহার বিভিন্ন রচনায় বিভিন্ন ঘটনার মাধ্যমে পাগল নির্ণয়ের যে সকল প্রকৃষ্ট পদ্ধতির বিষয়ে নির্দেশ করিয়াছেন তাহারই একটি এক্ষেত্রে উল্লেখ করা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক নয়।

ঘটনাটি এইরূপ - একজন বিদ্যালয় পরিদর্শক কোন বিদ্যালয় পরিদর্শনকালে সপ্তম শ্রেণীতে উপস্থিত হন অর্থাৎ তিনি পরিদর্শন করেন। শ্রেণীতে গণিতের শিক্ষক ছাত্রদের আঁক কষাইতেছেন। পরিদর্শক হঠাৎ স্বমস্তিষ্কপ্রসূত একটি আকস্মিক সমস্যার উত্থাপন করেন। সমস্যাটি তাঁহারই ভাষায় উল্লেখ করা যায় – “এখান থেকে লন্ডনের দূরত্ব ৫০০০ মাইল হলে এখন আমার বয়স কত?” এই প্রশ্নে ‘এখান’ এবং ‘এখন’ এই দুই শব্দের উপর প্রশ্নকর্তা বিশেষ জোর দেন। বলাবাহুল্য সপ্তম শ্রেণীর সর্বোৎকৃষ্ট ছাত্র এমনকি গণিতের শিক্ষক মহাশয় অবধি এ প্রশ্নের গাণিতিক সমাধানে কৃতকার্য হন নাই। কিন্তু সপ্তম শ্রেণীর নিকৃষ্টতম ছাত্র (যে বিগত ষাণ্মাসিক পরীক্ষায় গণিতে শূন্য পাইয়া ঘরে ও বাহিরে তিরস্কৃত) এই সমস্যার সমাধান করিতে উদ্যত হয়। হস্ত উপরে উঠাইয়া ছাত্র বলে “অঙ্ক হয়ে গেছে স্যার”। স্কুল পরিদর্শক জিজ্ঞাসা করিলেন “কত উত্তর পেয়েছ?” ছাত্র বলিল “স্যার উত্তর ৪৪ বছর”। পরিদর্শক যারপরনাই আত্মোদ্বিগ্ন হইয়া বলিলেন “একদম ঠিক বলেছ। আজই আমার বয়স ৪৪ বছর পূর্ণ হল। আচ্ছা বলত বাবা কি উপায়ে সমাধান করলে?” ছাত্রটি বলিল স্যার প্রখ্যাত গণিতজ্ঞ সুকুমার রায় সৃষ্ট পদ্ধতি, যার নাম ত্রৈরাশিক অর্থাৎ তিনটি রাশির দ্বারা অজানা রাশি নির্ধারণ। গণিত শিক্ষক অন্তঃসারশূন্য প্রশংসাপূর্বক ছাত্রটিকে ব্ল্যাকবোর্ডে আঁকটি কষিতে আহ্বান করিলেন। ছাত্রটি ত্রৈরাশিক পদ্ধতিতে যেরূপে সমাধান করে তাহা নিচে দেওয়া হইল।

প্রথম রাশি	দ্বিতীয় রাশি
১/২ (= অর্ধ পাগল)	বয়স = ২২
তৃতীয় রাশি	চতুর্থ রাশি
১ (= পূর্ণ পাগল)	বয়স = ৪৪

এক্ষেত্রে চতুর্থ রাশি অর্থাৎ ‘৪৪’ সংখ্যাটি সমস্যার সমাধানজ্ঞাপক। গণিত শিক্ষক হুৎকার ছাড়েন, “হু, অঙ্ক তো মিলেছে কিন্তু প্রথম দুই রাশি কোথা থেকে আমদানি করলি?”। ছাত্র অজ্ঞানবদনে বলিল “আমার এক আধপাগলা দাদা

আছে তার বয়স ২২”, পাগলত্বের মাত্রা নির্ধারণের এমন সরল অথচ যুক্তিসঙ্গত পদ্ধতি আজও আবিষ্কৃত হয় নাই।

বহুকালযাবৎ মনোরোগ বিশেষজ্ঞরা পাগলত্ব বিষয়ে বিভিন্ন পরীক্ষামূলক গবেষণা করিয়াছেন, তথাপি বিভিন্ন প্রকার পাগলত্ব এবং তাহার মাত্রা অর্থাৎ গুণগত (Qualitative) ও পরিমাণগত (Quantitative) পরিমাপ বিষয়ে তাঁহাদের আজও মুজতবা আলি, সুকুমার রায়, সরকারি স্কুল পরিদর্শক, সপ্তম শ্রেণীর অখ্যাত ছাত্র, নিদেনপক্ষে অমিতাভ পালের ন্যায় পাগল ইহাদের প্রয়োজন হয়। নিউটন যেমন তাঁহার গতিসূত্রে উল্লেখ করিয়াছেন কোন বস্তু নিজের উপর কোন বল প্রয়োগ করিতে পারেনা – তেমনি মনোরোগ বিশেষজ্ঞ (যাঁহারা সকলেই কিষ্টিতাদিক ...) নিজের পাগলামির পরিমাপ (গুণগত ও পরিমাণগত) করিতে অক্ষম। ইহার কারণ বোধ হয় আজ পর্যন্ত পাগলত্বের মূল উপাদান (Fundamental elements of madness) আবিষ্কৃত না হওয়া। এই গবেষণাপত্রে আমি পাগলত্বের মূল উপাদানের দুইটি কাঠামো (Model) প্রকাশ করিতে আগ্রহী।

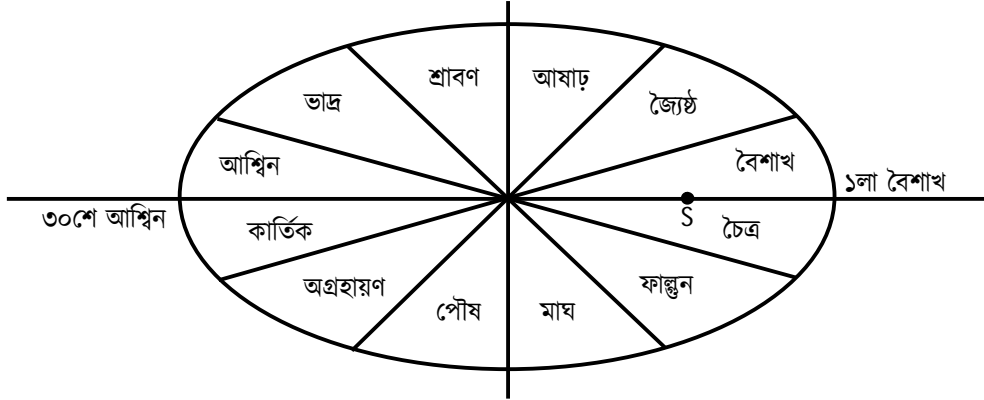
প্রথম মডেল – মুক্ত ছিটন তত্ত্ব (Free Chhiton Theory)

দ্বিতীয় মডেল – শৃঙ্খল তত্ত্ব (Chain Theory)

মুক্ত ছিটন তত্ত্ব

বস্তুবাদীরা বলিয়া থাকেন মস্তিষ্কের মূল উপাদান ঘিলু বা Brain। কিন্তু দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ (Dilectric materialism) অনুসারে ঘিলু দুই প্রকার বিপরীতধর্মী কণার সমন্বয়ে গঠিত – বুদ্ধিকণা (Intelligence Particle) এবং ছিটকণা (Chhiton)। ঘিলুর অভ্যন্তরে বুদ্ধিকণা ছিটকণাসমূহকে যথাসম্ভব দমন করিয়া থাকে, ফলে ছিটকণাগুলি আত্মপ্রকাশ করিতে সক্ষম হয়না। কিন্তু সে কারণে ছিটকণা বা ছিটন নিশ্চেষ্ট অবস্থান করেনা। দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের অনুপ্রেরণায় ডারউইনের বিবর্তনবাদ বিশ্বাস করিয়া ছিটকণাগুলি নিরন্তর প্রচেষ্টা চালাইয়া যায়। ইহার ফলে কতক ছিটকণা বুদ্ধির প্রভাবমুক্ত হইয়া মস্তিষ্কভ্যন্তরে অবাধ চলাফেরায় সক্ষম হয়, অর্থাৎ মুক্তিলাভ করে। তখন উহাদিগকে মুক্ত ছিটন (Free Chhiton) বলা হয়। যে ব্যক্তির মস্তিষ্কে মুক্ত ছিটন উৎপন্ন হয় তাঁহাকে ছিটগ্রস্থ বা Eccetric বলা হয়। সাধারণভাবে ছিটগ্রস্থ ব্যক্তির মধ্যে কোন উন্মাদনা লক্ষিত হয়না। কারণ মস্তিষ্কের দুই প্রান্তের উন্মাদ বিভব (Eccetric potential) সমান থাকে। কিন্তু যদি মস্তিষ্কের দুই প্রান্তের বিভবের মধ্যে একটি বৈষম্য (difference) প্রস্তুত করা যায় তখনই ছিটনকণাগুলি উচ্চবিভব প্রান্ত থেকে নিম্নবিভব প্রান্তের দিকে ধাবিত হয়। ফলস্বরূপ মস্তিষ্কে একটি ছিটপ্রবাহের (Chhiton Current) সৃষ্টি হয়। এই ছিটপ্রবাহের মাত্রা ওহমের সূত্রের অনুরূপ সূত্র মানিয়া চলে অর্থাৎ ঘরবাড়ি বা অন্যান্য স্থাবর সম্পত্তি অপরিবর্তিত থাকিলে মস্তিষ্কের ছিটপ্রবাহ, I , দুই প্রান্তের উন্মাদবিভব V -এর সমানুপাতিক, অর্থাৎ, $I \propto V$ অথবা, $I = CV$, এখানে C সমানুপাতিক ধ্রুবক। নির্দিষ্ট মস্তিষ্কে C -এর মান ধ্রুবক। বিভিন্ন মস্তিষ্কে C -এর মান বিভিন্ন। C -কে মস্তিষ্কের উন্মাদনা (crazyness) ধরা হয়। পরীক্ষার সাহায্যে প্রমাণিত হইয়াছে যে মস্তিষ্কের উন্মাদনার মান মস্তিষ্কের আকার (Size) এবং ব্যক্তির আকৃতির (Shape) উপর নির্ভরশীল। বস্তুত, উন্মাদনা মস্তিষ্কের আকারের সমানুপাতিক এবং

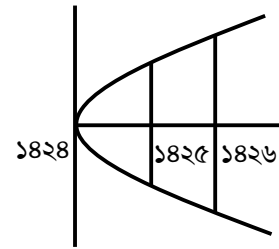
ব্যক্তির মুখশ্রীর ব্যাস্তানুপাতিক। অর্থাৎ মাথা যত মোটা হয় (স্থূলবুদ্ধি), উন্মাদনা তত বেশী হয় এবং মুখশ্রী যত মিষ্ট হয়, উন্মাদনা তত কম হয়। আকারকে A দ্বারা এবং আকৃতিকে S দ্বারা চিহ্নিত করিলে, উন্মাদনা $C \propto A$, $C \propto 1/S$, অর্থাৎ, $C \propto A/S$, অথবা, $C = EA/S$, এখানে E সমানুপাতিক ধ্রুবক যাহাকে মস্তিষ্কের উৎকেন্দ্রিকতা (Eccentricity) বলা হয়। বলাবাহুল্য একই উৎকেন্দ্রিকতাবিশিষ্ট বিভিন্ন মস্তিষ্কের উন্মাদনা বিভিন্ন হইতে পারে। উৎকেন্দ্রিকতার মান অনুসারে সকল উন্মাদকে প্রাথমিকভাবে দুইভাগে ভাগ করা যায় – বন্ধোন্মাদ (Closed lunatic) এবং



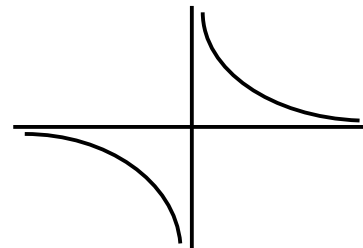
চিত্র ১ : বন্ধ উন্মাদের উন্মাদনার লেখচিত্র (উপবৃত্ত)

মুক্তোন্মাদ (Opened lunatic)। সময়ের সাথে উন্মাদনার তারতম্য যে লেখচিত্র অনুসরণ করে তাহার আকৃতিই উন্মাদের শ্রেণী নির্ণয় করে। সময়-উন্মাদনার লেখচিত্রটি একটি আবদ্ধ পথ (Closed loop) নির্দেশ করিলে উন্মাদকে 'বন্ধ' ধরা হয় এবং ঐ লেখচিত্র মুক্তপথ নির্দেশ করিলে উন্মাদ হয় 'মুক্ত'। নিম্নে উভয় প্রকার উন্মাদের ক্ষেত্রেই উন্মাদনার লেখচিত্র দেখানো হইয়াছে।

চিত্র ১-এ বন্ধ উন্মাদের উন্মাদনা লেখচিত্র দেখানো হইয়াছে। বন্ধপথে (Closed loop) উন্মাদনার হ্রাস-বৃদ্ধি হয় বলিয়া বৎসরের পর বৎসর উন্মাদনা একই নিয়মে পরিবর্তিত হয়। এক্ষেত্রে লেখচিত্রটি একটি উপবৃত্ত (Ellipse) সুতরাং ইহার উৎকেন্দ্রিকতা (Eccentricity) ১ অপেক্ষা কম। উৎকেন্দ্রিকতা ১ অথবা তদাপেক্ষা অধিক হইলে উন্মাদনা লেখচিত্র মুক্তপথে চলে। চিত্র ২(ক) এবং চিত্র ২(খ)-তে দুই প্রকার মুক্ত উন্মাদনা লেখচিত্র দেখানো হইয়াছে। ২(ক)-এর লেখচিত্রটি অধিবৃত্ত (parabola) যাহার উৎকেন্দ্রিকতা ১ কিন্তু ২(খ)-এর লেখচিত্র পরাবৃত্ত যাহার উৎকেন্দ্রিকতা ১ অপেক্ষা



(ক) অধিবৃত্ত



(খ) পরাবৃত্ত

চিত্র ২: মুক্ত উন্মাদের উন্মাদনার লেখচিত্র

বেশী। বাহ্যিক আচরণের ভিত্তিতে বদ্ধ এবং মুক্ত উন্মাদের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা সম্ভব। অন্ধ-বিদ্যার্জন, প্রভূত অর্থ-উপার্জন এবং বিপুল সামাজিক, রাজনৈতিক, আধ্যাত্মিক খ্যাতির প্রভাবে মানুষ বদ্ধ উন্মাদনা লাভ করে। তাঁহার আচার-ব্যবহারে দাস্তিকতা, জেদ, সকলের উপর প্রভুত্ব করিবার বাসনা, রক্ষণশীলতা, মৌলবাদ ইত্যাদি প্রকাশ পায়। মুক্ত উন্মাদ জাতি মানব সমাজের গর্ব। ইহারা দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, সাধক ইত্যাদি পর্যায়ে পড়েন। মুক্ত উন্মাদগণ সর্বদাই জগতের কল্যাণ কার্যে নিয়ত। ইহারা মানবজাতিকে সঠিক পথে পরিচালনা করিতে আত্মনিয়োগ করেন। সত্রেতিসকে প্রথম মুক্ত উন্মাদ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। পরবর্তীকালে গ্যালিলিও, নিউটন, আইনস্টাইন, হাইজেনবার্গ, শ্রডিঞ্জার, অন্যদিকে আব্রাহাম লিঙ্কন, কার্ল মার্ক্স, রোমা রোঁলা, রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, রামমোহন, বিদ্যাসাগর সকলেই মুক্ত উন্মাদ পর্যায়ে পড়েন। তবে ইহারা সকলেই অধিবৃত্তীয় মুক্ত উন্মাদ, যাঁহাদের উৎকেন্দ্রিকতা ১। পরাবৃত্তীয় মুক্ত উন্মাদদিগকে (যাঁহাদের উৎকেন্দ্রিকতা ১ অপেক্ষা অধিক) যুগাবতার বলিয়া ঘোষণা করা হয়। এই পর্যায়ে ভগবান স্বয়ং বা তাঁহার কোন নিকট আত্মীয় হইয়া থাকেন।

শৃঙ্খল তত্ত্ব

উন্মাদনার দ্বিতীয় তত্ত্বটি হইল শৃঙ্খল কাঠামো অর্থাৎ Chain Model। পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, মস্তিষ্কে দুই প্রকার বিপরীতধর্মী কণার সমন্বয়ে গঠিত, উহাদের যথাক্রমে বুদ্ধিকণা ও ছিটকণা নামে অভিহিত করা হয়। কোন কোন বিশেষজ্ঞের মতে একটি বুদ্ধিকণা এবং একটি ছিটের সমন্বয়ে গঠিত হয় একটি পাগল-দ্বিমেরু বা Maddipole। পাগল-দ্বিমেরু শব্দটি অপভ্রংশের ফলে অধুনা পান-ভোমরা নামে প্রচলিত। একটি পান-ভোমরার একপ্রান্তে থাকে বুদ্ধিকণা আর অন্যপ্রান্তে ছিট।

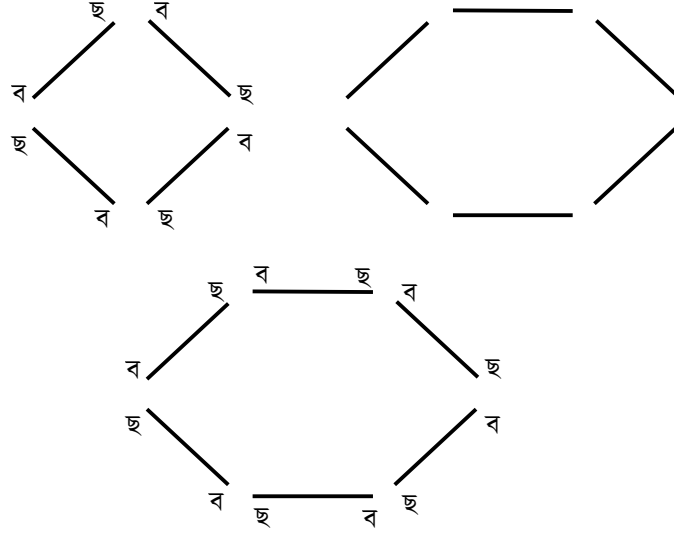


চিত্র ৩ : পান-ভোমরা

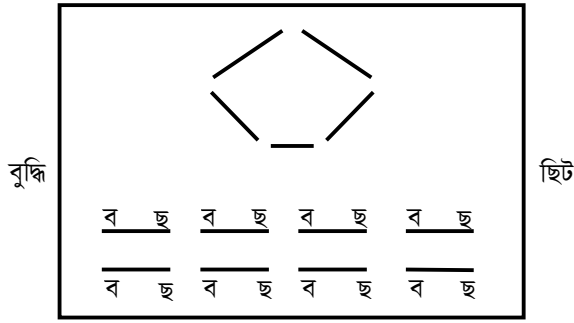
পান-ভোমরা মস্তিষ্কে দুই প্রকারে সজ্জিত হইতে পারে – বদ্ধশৃঙ্খল এবং মুক্তশৃঙ্খল সজ্জা। চিত্র ৪ এবং চিত্র ৫, ৬-এ এই দুই প্রকার সজ্জা প্রদর্শিত হইয়াছে।

চিত্র ৫ এবং চিত্র ৬-এ যথাক্রমে আংশিক মুক্তশৃঙ্খল এবং পূর্ণ মুক্তশৃঙ্খল সজ্জা প্রদর্শিত হইয়াছে। এক্ষেত্রে মস্তিষ্কের বদ্ধশৃঙ্খল সজ্জা বদ্ধ উন্মাদ নির্দেশ করে। দুই প্রকার মুক্তশৃঙ্খল সজ্জা – আংশিক এবং পূর্ণ – যথাক্রমে অধিবৃত্তীয় এবং পরাবৃত্তীয় মুক্ত উন্মাদ নির্দেশ করে।

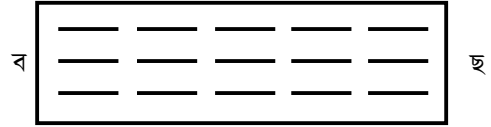
শৃঙ্খল তত্ত্বের বৈশিষ্ট্য ইহাই যে, যে কোন বদ্ধ উন্মাদ মুক্ত উন্মাদের প্রভাবে আংশিক শৃঙ্খল মোচনের ফলে মুক্ত উন্মাদে রূপান্তরিত হইতে পারে। রূপান্তরের কাল্পনিক চিত্র (schematic diagram) পরবর্তী পৃষ্ঠায় প্রদর্শিত হইয়াছে।



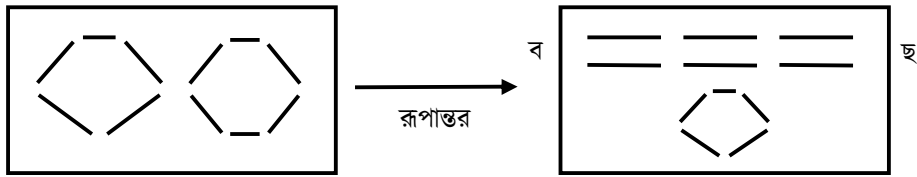
চিত্র ৪ : বদ্ধশৃঙ্খল সজ্জা; ব -> বুদ্ধিকণা, ছ -> ছিট



চিত্র ৫ : আংশিক মুক্তশৃঙ্খল সজ্জা



চিত্র ৬ : পূর্ণ মুক্তশৃঙ্খল সজ্জা



চিত্র ৭

শৃঙ্খল তত্ত্ব অনুসারে উন্মাদের শ্রেণীবিভাগ –

- (১) বদ্ধ - প্রভূত অর্থবান, শিক্ষিগত ডিগ্রীধারী, সামাজিক প্রতিষ্ঠিত, বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ।
- (২) আংশিক মুক্ত - দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, সাধক, মানবকল্যাণকারী।
- (৩) পূর্ণ মুক্ত - ভগবান = $\sqrt{\text{ভূত}} = 0^*$

*কঠিন গাণিতিক সমাধানটি বৈজ্ঞানিক পরিশ্রমের গবেষণা হইতে প্রাপ্ত।

সেরা গবেষণাপত্রের সন্ধানে

– ডঃ ভূপতি চক্রবর্তী, প্রাক্তন অধ্যাপক

সেরা একশ কিংবা নির্বাচিত পঞ্চাশ আমাদের বেশ চেনা। সাহিত্যের জগতে নানা ধরনের হাসির গল্প বা প্রেমের গল্প অথবা কবিতা, এমনকি, প্রবন্ধের সঞ্চলনের ক্ষেত্রে সেরার তালিকায় ঠাঁই পাওয়া, অনেক ক্ষেত্রে সঞ্চলক বা সম্পাদকের বিবেচনার ওপর নির্ভরশীল, তাই এ নিয়ে কিছু বিতর্কও থেকে যায়। তবু সেরা কোনো কিছুর বিষয়ে আমাদের আগ্রহ সর্বদাই লক্ষ্য করা যায়।

আর তাই প্রশ্ন উঠে আসে যে, বিজ্ঞানের অজস্র শাখা বা সমাজবিজ্ঞানের বহু শাখায় প্রতি বছর যে বিপুল পরিমাণ গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয় তাদের মধ্যে কোনগুলি সেরা? কোনগুলি ওই সেরা একশতে জায়গা পেতে পারে কিংবা তা কিভাবে নির্ধারণ করা সম্ভব? কেবল গবেষক মহল নয়, বিষয়টিতে কিন্তু আগ্রহ রয়েছে আরও অনেকের। এর মধ্যে রয়েছে বৃহত্তর ছাত্র গোষ্ঠী, বা গবেষক ছাত্রেরা, সরকারি বিভাগ। বহু বেসরকারি বাণিজ্যিক সংস্থার যারা সুনির্দিষ্ট ব্যবসায়িক লক্ষ্যকে মাথায় রেখে নানা গবেষণায় অর্থ বিনিয়োগ করে, আগ্রহ রয়েছে তাদেরও। তাই সেরা গবেষণাপত্র বা পেপারের নির্বাচন হওয়া চাই বস্তুনিষ্ঠ, যুক্তিনির্ভর ও তথ্যভিত্তিক; সেখানে সঞ্চলক, সম্পাদক বা প্রকাশকের পছন্দ বা অপছন্দের কোনো স্থান নেই।

সেরা গবেষণাপত্র খুঁজে বার করা খুব সহজ নয় কারণ কোন বিষয়ের ওপর নির্ভর করে কোনো বিশেষ পেপারকে সেরার তালিকায় স্থান দেওয়া হবে অথবা তাকে বাদ দেওয়া হবে সেটা কিভাবে নির্ণয় করা সম্ভব? গবেষণাপত্রের প্রকৃত গুরুত্ব লুকিয়ে রয়েছে তার উল্লেখিকরণে, ইংরাজিতে যার বেশ চালু নাম হল সাইটেশান (citation)। অর্থাৎ একটি গবেষণাপত্র প্রকাশিত হওয়ার পর একই ক্ষেত্রের বা সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ক্ষেত্রের গবেষক ও বিজ্ঞানীরা যদি সেই গবেষণা কাজকে গুরুত্বপূর্ণ এবং তাদের নিজস্ব গবেষণার পক্ষে সহায়ক বলে বিবেচনা করেন তাহলে তাদের গবেষণাপত্রে প্রথম পেপারটির গবেষণার বিষয়টি উল্লিখিত হয়। পরিভাষায় একে বলা হয় সাইটেশান। একটি গবেষণাপত্র প্রকাশিত হওয়ার পরে তার গবেষণাফল অন্য গবেষকদের পেপার যত বেশি উল্লেখ করে, বুঝে নিতে হবে সেই পেপারের গুরুত্ব তত বেশি। সেরার দৌড়ে থাকবে সে এগিয়ে। কেবল বিখ্যাত বিজ্ঞানীর গবেষণাপত্র নিশ্চয়ই সেরার তালিকায় সরাসরি উঠে যাবে না। কিংবা কোনো অতি প্রসিদ্ধ আবিষ্কারের ঘোষণা যে পেপারে ঘটেছিল তাও চট করে সেরার তালিকায় ঠাঁই পাবে না। তাই বোঝা যায় যে কোনো নোবেলজয়ী একটি গবেষণাপত্রের অন্যতম রচয়িতা হলেই সেটি সেরার তালিকায় উঠে আসবে না। সেরার নির্বাচন হবে সাইটেশান নির্ভর।

এখানেই রয়েছে বড় প্রশ্ন। ধরা যাক ড. দাসের একটি পেপার অধ্যাপক দত্ত, ড. পাল আর ড. কুমার তাদের তিনটি গবেষণাপত্রে উল্লেখ করেছেন, অর্থাৎ ড. দাসের পেপারটি তিনটি

সাইটেশান পেয়ে গেছে। এরপর সম্ভবত আরও সাইটেশান পেপারটি পাবে। তা এর হিসেবটা কে রাখবে বা কিভাবে রাখবে? এই কাজটি প্রথম শুরু করেন ইউজিন গারফিল্ড নামের এক বিজ্ঞানী ১৯৬৪ সালে। সেই সময় যেটুকু কম্পিউটারের সাহায্য পাওয়া গিয়েছিল তা নিয়ে তিনি সেই ১৯০০ সাল থেকে প্রকাশিত বিজ্ঞানের ও সমাজবিজ্ঞানের সমস্ত শাখার প্রকাশিত পেপারের ক্ষেত্রে এই উল্লেখিকরণের বিষয়টির রেকর্ড রাখার কাজ শুরু করেন। তারপর অবশ্য বিষয়টির ক্রমশ উন্নতি হয়েছে। গবেষণা পত্রিকার সংখ্যায় বিপুল বৃদ্ধি, গবেষণাপত্রের সংখ্যা ও বৈচিত্র্যের ব্যাপক প্রসার ঘটবার সঙ্গে সঙ্গে তাল মিলিয়ে এই রেকর্ড রাখার পদ্ধতিতে পরিবর্তন এসেছে, তবে বিষয়টিকে ক্রমাগত আরও নির্ভরযোগ্য করে তোলার চেষ্টা সর্বদাই কাজ করে গেছে।

খুব বেশি সংখ্যক সাইটেশান পাওয়া পেপারের পরিচয় সচরাচর সেই বিষয়টির বিজ্ঞানী গবেষক মহলেই সীমাবদ্ধ থাকে। আর সেখানে ধরা পড়েছে যে সব থেকে বেশি সাইটেশান পাওয়া পেপারগুলির মধ্যে নোবেলজয়ী বিজ্ঞানীদের কাজ কমই রয়েছে। তবে এক অর্থে প্রায় সাধারণ মানুষের পরিচিত একটি পেপার অন্তত পদার্থবিদ্যার সেরা দশে রয়েছে। আইনস্টাইন ১৯০৫ সালে তাঁর যে গবেষণাপত্রটিতে ভর ও শক্তি সমতুল বলে ঘোষণা করেছিলেন, যেখানে $E=mc^2$ হিসাবে পরিচিত অতি বিখ্যাত সমীকরণটি ছিল, পদার্থবিদ্যায় উচ্চ সাইটেশান পাওয়া পেপারের মধ্যে সেটি রয়েছে। সম্ভবত এটি আইনস্টাইনের মুকুটে বহু পালকের সঙ্গে আরও একটি সংযোজন।

জ্বালানি কোশ - একটি বিকল্প শক্তির উৎস

– ডঃ অংশুমান নন্দী, অধ্যাপক

পরিবেশবিদরা বহু দিন ধরে এমন একটি শক্তি উৎসের স্বপ্ন দেখে এসেছেন যেটি দূষণমুক্ত শক্তি উৎপাদনে সক্ষম। দূষণহীন বিকল্প শক্তির উৎস বলতে আমরা সাধারণত সৌর শক্তি এবং বায়ু শক্তির কথাই বুঝি। নিঃসন্দেহে এগুলি দূষণমুক্ত এবং যথেষ্ট পরিমাণে শক্তি উৎপাদনে সক্ষম। তবে এই ধরনের শক্তি উৎসের সমস্যা হল এরা অতিরিক্ত পরিমাণে আবহাওয়া এবং জলবায়ুর উপর নির্ভরশীল। সৌরশক্তির উৎপাদন ক্ষমতা দিনের বেলায় সীমাবদ্ধ। বায়বীয় শক্তি শান্ত আবহাওয়ায় অনেক কম উৎপাদনশীল। এই ধরনের শক্তির উৎসগুলির ব্যবহার এখন পর্যন্ত খুবই সীমিত।

১৯৬২ সালে শক্তি উৎস সংক্রান্ত গবেষণায় একটি বিপ্লব ঘটে। ওয়েস্টইংহাউস ইনস্ট্রিক কর্পোরেশন একটি বিকল্প শক্তি উৎসের সন্ধান দেন। এই উৎসটির নাম “জ্বালানি কোশ”। বর্তমানে এই জ্বালানি কোশ নিয়ে বহুল পরিমাণে গবেষণা চলছে। এই প্রকার কোশ হাঙ্কা, বহনযোগ্য এবং দূষণমুক্ত শক্তি উৎপাদনে সক্ষম। এর সবচেয়ে বড় সুবিধা হল, এটি আবহাওয়া বা পরিবেশের উপর নির্ভরশীল নয়।

জ্বালানি কোশ একটি তড়িৎ রাসায়নিক কোশ যেখানে রাসায়নিক শক্তি তড়িৎশক্তিতে রূপান্তরিত হয়। জ্বালানি হিসাবে এই কোশগুলিতে সহজলভ্য কিছু জৈব রাসায়নিক যেমন মিথেন, গ্যাসোলিন, গোবর গ্যাস, ডিজেল ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়। এই গ্যাসগুলির জলের সঙ্গে বিক্রিয়া এবং অক্সিজেন ও হাইড্রোজেনের যে স্বাভাবিক বিক্রিয়া করার ক্ষমতা সেটিকে নিয়ন্ত্রণ করে এই কোশগুলির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত তড়িৎ শক্তি উৎপাদন সম্ভব। আধুনিক তাপ তড়িৎ উৎসগুলি যেখানে ৩০-৪০ শতাংশ শক্তি রূপান্তরে সক্ষম সেখানে এই জ্বালানি কোশ ৬০-৭০ শতাংশ শক্তি রূপান্তরে সক্ষম। উচ্চ উৎপাদন ক্ষমতা এবং সহজলভ্য জ্বালানির ব্যবহার এই কোশগুলিকে ধীরে ধীরে জনপ্রিয় করে তুলছে। অন্যদিকে এই তড়িৎ উৎসগুলি সম্পূর্ণরূপে দূষণমুক্ত ও বিশ্বাসযোগ্য।

অন্যান্য তড়িৎ কোশগুলির মত এটিতেও ধনাত্মক ও ঋণাত্মক তড়িৎদ্বার এবং তড়িৎবিশ্লেষ্য বর্তমান। কোশটির তড়িৎদ্বারগুলি ছিদ্রযুক্ত, যে ছিদ্রগুলি দিয়ে একদিকে জৈব গ্যাস ও অন্যদিকে বায়ু প্রবাহিত করা হয়। একটি তড়িৎদ্বার বায়ুর অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া করে অক্সিজেন আয়ন তৈরি করে, যেগুলি তড়িৎবিশ্লেষ্যর মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়ে অন্য তড়িৎদ্বারে পৌঁছয়। জৈব গ্যাস থেকে প্রাপ্ত হাইড্রোজেন এবং এই অক্সিজেনের বিক্রিয়ায় জল, কার্বন ডাই অক্সাইড, তাপ এবং সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য রূপে মুক্ত ইলেকট্রন উৎপন্ন হয়। এই ইলেকট্রনগুলি কোশ থেকে তড়িৎবাহী তারের মাধ্যমে বিভিন্ন যন্ত্রের মধ্যে চালনা করা হয়।

এই কোশগুলির আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল, কোশটির প্রতিটি উপাদানই কঠিন। কোশটির ক্যাথোডরূপে ম্যাঙ্গানেট যৌগ, অ্যানডরূপে নিকেল মিশ্রিত জিরকনিয়া, তড়িৎবিশ্লেষ্যরূপে ইটরিয়া-জিরকনিয়া যৌগ ব্যবহার করা হয়, যার প্রতিটি কঠিন অবস্থায় ব্যবহৃত হয়। এইজন্য কোশগুলিকে গবেষকরা “কঠিন অক্সাইড জ্বালানি কোশ” বলে অভিহিত করেন।

প্রাথমিক ভাবে এই কোশগুলিকে গাড়িতে, বাড়িতে, অফিসে এবং ব্যবসা ক্ষেত্রে ব্যবহার করা সম্ভব। প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে এই কোশগুলি খুবই প্রয়োজনীয়, কারণ এগুলি বহনযোগ্য, হালকা ও শব্দমুক্ত শক্তি তৈরিতে সক্ষম। দূরবর্তী গ্রামগুলিতে তড়িৎ উৎস হিসাবে এগুলি ব্যবহার করা যেতে পারে। বর্তমানে আমেরিকা সরকার এই শক্তির উৎসকে জনপ্রিয় করার জন্য নির্দিষ্ট কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। সিমেন্স কোম্পানি অস্ট্রেলিয়ায় এই কোশের ব্যবসায়িক উৎপাদন শুরু করেছে। বর্তমানে এই কোশগুলিকে আরও উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন এবং বহুল ব্যবহারযোগ্য করার জন্য গবেষণা চলছে। আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে আমাদের দেশেও এর ব্যবহার লক্ষ্য করা যাবে।

The Annus Mirabilis

– Dr. Kausik Mukhopadhyay, Lecturer

1905, this is the year often called “*the annus mirabilis*” or the “*miracle year*” in English or *Wunderjahr* in German. In this year Albert Einstein wrote four articles, which contributed substantially to the foundation of modern physics and changed views on space, time, mass, and energy. The *Annus mirabilis papers* (from Latin *annus mīrābilis*, “extraordinary year”) are the papers of Albert Einstein published in the *Annalen der Physik* scientific journal in 1905. At the time the papers were written, Einstein did not have easy access to a complete set of scientific reference materials, although he did regularly read and contribute reviews to *Annalen der Physik*. Additionally, scientific colleagues available to discuss his theories were few. He worked as an examiner at the Patent Office in Bern, Switzerland. Through these papers, Einstein tackles some of the era's most important physics questions and problems.

Annus mirabilis papers:

1. Photoelectric effect

The paper, “On a Heuristic Viewpoint Concerning the Production and Transformation of Light”, received March 18 and published June 9, proposed the idea of *energy quanta*. This idea, motivated by Max Planck's earlier derivation of the law of black body radiation, assumes that luminous energy can be absorbed or emitted only in discrete amounts, called *quanta*. Einstein states, Energy, during the propagation of a ray of light, is not continuously distributed over steadily increasing spaces, but it consists of a finite number of energy quanta localised at points in space, moving without dividing and capable of being absorbed or generated only as entities.

2. Brownian motion

The paper “On the Motion of Small Particles Suspended in a Stationary Liquid, as required by the Molecular Kinetic Theory of Heat”, received May 11 and published July 18, delineated a stochastic model of Brownian motion. In this paper it will be shown that, according to the molecular kinetic theory of heat, bodies of a microscopically visible size suspended in liquids must, as a result of thermal molecular motions, perform motions of such magnitudes that they can be easily observed with a microscope. It is possible that the motions to be discussed here are identical with so-called Brownian molecular motion.

3. Special relativity

The paper “On the Electrodynamics of Moving Bodies”, his third paper that year, was received on June 30 and published September 26. It reconciles Maxwell's equations for electricity and magnetism with the laws of mechanics by introducing major changes to mechanics close to the speed of light. This later

became known as Einstein's special theory of relativity. The paper mentions the names of only five other scientists, Isaac Newton, James Clerk Maxwell, Heinrich Hertz, Christian Doppler, and Hendrik Lorentz. It does not have any references to any other publications. Many of the ideas had already been published by others, as detailed in history of special relativity and relativity priority dispute. However, Einstein's paper introduces a theory of time, distance, mass, and energy that was consistent with electromagnetism, but omitted the force of gravity.

4. Mass–energy equivalence

On November 21 *Annalen der Physik* published a fourth paper (received September 27), "Does the Inertia of a Body Depend Upon Its Energy Content?", in which Einstein developed an argument for arguably the most famous equation in the field of physics: $E = mc^2$.

Einstein considered the equivalency equation to be of paramount importance because it showed that a massive particle possesses an energy, the "rest energy", distinct from its classical kinetic and potential energies. The paper is based on James Clerk Maxwell's and Heinrich Rudolf Hertz's investigations and, in addition, the axioms of relativity, as Einstein states, The results of the previous investigation lead to a very interesting conclusion, which is here to be deduced. The previous investigation was based "on the Maxwell-Hertz equations for empty space, together with the Maxwellian expression for the electromagnetic energy of space ..." The laws by which the states of physical systems alter are independent of the alternative, to which of two systems of coordinates, in uniform motion of parallel translation relatively to each other, these alterations of state are referred (principle of relativity).

আইনস্টাইন: দূরের মানুষ?

– পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাক্তন অধ্যাপক

অ্যালবার্ট আইনস্টাইন এবং কলকাতার সিটি কলেজ একদম এক বয়সী! রাজা রামমোহন সরণীতে কলেজের যে বাড়ী তার প্রধান প্রবেশদ্বার দিয়ে ঢুকে সামনের সিঁড়ি দিয়ে একটু উঠলেই চোখে পড়ে সেই শ্বেতপাথরের ফলক যাতে লেখা আছে কলেজের জন্ম ১৮৭৯ সনে। ঐ বছরই আইনস্টাইনও জন্মগ্রহণ করেন। এটা অবশ্যই একটা মজার সমাপতন – তার বেশী কিছু নয়। কিন্তু সিটি কলেজের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ থেকে প্রকাশিত পত্রিকায় আইনস্টাইন সম্বন্ধে আলোচনার গোড়াপত্তন যদি এই মজার তথ্যটি দিয়ে হয় তাতে ক্ষতি কি?

আইনস্টাইন তাঁর জীবদ্দশাতেই কিংবদন্তীতে পরিণত হয়েছিলেন। সারা পৃথিবীর আগ্রহ ছিল তাঁকে জানার, বোঝার। বিজ্ঞানী মহলের বাইরেও তাঁর ব্যতিক্রমী চরিত্র এবং অলোকসামান্য প্রতিভা আকর্ষণ করেছিল অনেক গুণী মানুষকে। তার মধ্যে আমাদের রবীন্দ্রনাথও আছেন।

“একক, নিঃসঙ্গ মানুষ বলে আইনস্টাইনের খ্যাতি আছে। তুচ্ছাতিতুচ্ছের ভিড় থেকে গাণিতিক ভাবনা ও দৃষ্টি মানুষের মনকে মুক্তি দেয় যেখানে, সেখানে তিনি একক বৈকি। তাঁর জড়বাদকে তুরীয় বলা চলে, দার্শনিক ধ্যান ধারণার সীমান্ত-মুখী, সীমাবদ্ধ অহম্-এর জটিল জাল থেকে - জগত থেকে - নিঃসম্পর্ক মুক্তি হয়তো সেখানে সম্ভবপর।”- লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, ১৯৩০ সালে আইনস্টাইনের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের পরে।

প্রিন্সটনের এক বৃদ্ধ দ্বাররক্ষক আইনস্টাইনের খুব অনুরাগী। অথচ সে তাঁর তত্ত্বের কিছুই বোঝে না। কেন আইনস্টাইনকে এত পছন্দ করে সে, জিজ্ঞেস করায় বলে: যখন ওঁর কথা ভাবি তখন মনে হয় আমি একা নই।

এই হ’লেন আইনস্টাইন – দূরের, কাছের।

আমরা যারা রবীন্দ্রনাথ বা ঐ বৃদ্ধের মত তাঁকে চোখে দেখিনি – জন্মেছি অন্য দেশে, কালে তারা আইনস্টাইনের কোন ছবিটাকে ধরব, কাছের না দূরের? পদার্থ বিজ্ঞানের সুবিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণে যে আইনস্টাইনের সঙ্গে পরিচয় হয় তিনি আশ্চর্য অদ্ভুত এবং দূরের মানুষ। কালের চোখে নিশ্চয় সেই পরিচয়টাই বড়, স্থায়ী। কিন্তু সেটাই কি সব? আজ পশ্চিমবাংলায় বা ভারতবর্ষে যারা বিজ্ঞান পড়ে, তা নিয়ে ভাবে, যারা পেছোনো পরীক্ষার বা বিলম্বিত ফলাফলের অপেক্ষায়, কিংবা যারা সদ্য গবেষণা শুরু করতে চলল - তাদের সমস্যা-বেদনার জগতের সঙ্গে বিশ শতকের বৈজ্ঞানিক কিংবদন্তীর নায়ক এই মানুষটির নিজস্ব জগতের কি কোন মিল খুঁজে পাওয়া সম্ভব? এইরকম একটা প্রশ্ন মনে রেখেই এই প্রবন্ধের অবতারণা।

একাকীত্ব আজীবন আইনস্টাইনের সঙ্গী। ছেলেবেলা থেকেই লাজুক, মুখচোরা ছিলেন - একা থাকতেই ভালবাসতেন বেশী। স্কুলে ছিলেন একা, সমবয়স্কদের তুলনায় বেশী সংবেদনশীল ও যুক্তি আশ্রয়ী মানসিকতার জন্য। আবার ইলুদি বলেও ছেলেরা বাঁকা চোখে দেখত তাঁকে। প্রথম যৌবনে একা হয়ে পড়েন তাঁর আপেক্ষিকতার তত্ত্বের জন্য - তখনকার প্রতিষ্ঠিত বৈজ্ঞানিকদের এক বিপুল অংশ এই বৈপ্লবিক তত্ত্বের তাৎপর্য অনুধাবনে ব্যর্থ হন। তীব্র সমালোচনা ও বিদ্বেষের বাণে বিদ্ধ হতে হয় তাঁকে। এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য যে আপেক্ষিকতার তত্ত্ব নিয়ে এত মতানৈক্য ছিল বলেই আইনস্টাইনের নোবেল পুরস্কারের ঘোষণাপত্রে তার কোন স্পষ্ট উল্লেখ ছিল না। তিনি পুরস্কৃত হন - "তত্ত্বীয় পদার্থবিদ্যায় তাঁর অবদানের জন্য ও বিশেষত: আলোকবিদ্যুত প্রক্রিয়ার সূত্র আবিষ্কারের জন্য।"

অবশ্য দু-এক দশকের মধ্যেই চিত্রটি পরিবর্তিত হয়। প্রথমে আপেক্ষিকতার "বিশেষ" ও পরে "সাধারণ" তত্ত্বের স্বপক্ষেও জোরালো প্রমাণ মেলে পরীক্ষা-নিরীক্ষা থেকে। বিশ্ব-ব্যাপারে বৈজ্ঞানিকদের ধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গির মৌলিক পরিবর্তন ঘটে যায়। সঙ্গে সঙ্গে ঐ তত্ত্বের স্রষ্টাও পেয়ে যান বিশ্বজোড়া খ্যাতি ও স্বীকৃতি। যদিও এই সম্মানের আসনে তিনি অধিষ্ঠিত ছিলেন আমৃত্যু তবু শেষ বয়সে মতান্তর ও মতবিরোধ তাঁকে আবার একাকীত্বের দিকে ঠেলে দেয়। এবার বিরোধ ঘটে নবীনতর বিজ্ঞানীদের সঙ্গে কোয়ান্টাম তত্ত্বের ক্ষেত্রে "সম্ভাব্যতা" ও "কার্যকারণ" সম্পর্কের তাৎপর্য এবং ব্যাখ্যা নিয়ে। জীবনের শেষ তিরিশ বছর প্রিন্সটনে সেই একাকীত্বের মধ্যেই কাটল তাঁর। ব্যক্তিগত জীবনে হারালেন প্রিয় বন্ধুদের - Langevin চলে গেলেন। Ehrenfest আত্মহত্যা করলেন। চলে গেলেন সহধর্মিণী এলসা, যাঁর ভালোবাসা ও সেবা প্রায় পক্ষী-মাতার মত ঘিরে রেখে তাঁকে গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় সময়টুকু তৈরী করে দিয়েছিল চিরকাল। আর এইসব সয়ে অচঞ্চল আইনস্টাইন একাকী মগ্ন হয়ে রইলেন Unified Field Theory রচনার কাজে। অথচ ঐ সময়েই তাঁর খ্যাতি উঠেছে তুঙ্গে। বৈজ্ঞানিক মহলের বাইরে সাধারণ মানুষের মধ্যেও তাঁকে নিয়ে বিস্ময় ও আগ্রহের সীমা নেই। তাঁকে ঘিরে গড়ে উঠেছিল এতসব অবিশ্বাস্য গল্প যে জীবদ্দশাতেই তিনি কল্পকথার নায়ক হয়ে উঠেছিলেন। একটি ছোট্ট মেয়ে তাঁকে চিঠিতে লিখেছিল- 'সত্যিই তুমি আছ কিনা এটা পরখ করতেই আমি চিঠিটা লিখছি'।

নিজে এ প্রসঙ্গে বলেছিলেন - "অধিকাংশ সময় আমি তাই করি যা আমার অন্তঃপ্রকৃতি আমায় করতে বলে। এর জন্য এত সম্মান ও ভালোবাসা লাভ করাটা খুবই অস্বস্তিকর। আমায় লক্ষ্য করে ঘৃণার শরও নিষ্ফিণ্ড হয়েছে - কিন্তু তারা আমায় স্পর্শ করতে পারেনি; কেন জানিনা, তাদের জগৎ অন্য। তার সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক নেই। আমি সেই একাকীত্বের মাঝে বাস করি যা যৌবনে বেদনাদায়ক, কিন্তু পরিণত বয়সে উপভোগ্য।"

কিন্তু ঠিক এই জায়গাতেই এই 'অন্য জগতের' একক মানুষটিকে ভুল বোঝার একটা অবকাশ থেকে যায়। দৈনন্দিন তুচ্ছতার ভিড় থেকে দূরে থাকার এই বাসনা কিন্তু কখনোই তাঁর

মধ্যে আশেপাশের মানুষজনের বা বৃহত্তর সমাজের প্রতি দায়িত্ব অস্বীকারের রূপ নেয়নি। সামাজিক অন্যায়ের প্রতিবাদে তিনি মুখর হয়েছেন বারবার। যে ইহুদি বিদ্বেষ ও হিটলারি ফ্যাসিবাদের শিকার তিনি নিজে হয়েছিলেন তার বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া তো খুবই স্বাভাবিক তাঁর পক্ষে; কিন্তু পরবর্তীকালে আমেরিকায় নিগ্রোদের প্রতি দুর্ব্যবহারও তাঁকে বিচলিত করে, বলেন - "আমেরিকায় প্রত্যেকেই তার ব্যক্তিসত্তার মূল্য সম্বন্ধে আস্থা বোধ করে। কেউ-ই অন্য কোনও ব্যক্তি বা শ্রেণীর কাছে নিজেকে ছোটো করে না। এমন কি ধনের বিপুল বৈষম্য, মুষ্টিমেয় লোকের প্রচুর ক্ষমতা কিছুই এই সুস্থ আত্মনির্ভরশীলতাকে এবং অন্যের স্বাতন্ত্র্যের প্রতি এই স্বাভাবিক মর্যাদাবোধকে অবদমিত করতে পারে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমেরিকানদের সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির একটা অন্ধকার দিক আছে। তাদের এই সমানাধিকার এবং মানবিক-মর্যাদার বোধ কেবলমাত্র সাদা চামড়ার লোকেদের মধ্যেই সীমিত। শ্বেতকায়দের নিজেদের মধ্যেও নানান অন্ধ সংস্কার আছে যার সম্বন্ধে একজন ইহুদী হিসেবে আমি খুবই সচেতন। কিন্তু অ-শ্বেতকায় জনগোষ্ঠীগুলির প্রতি, বিশেষত নিগ্রোদের প্রতি সাদা চামড়ার লোকেদের যা মনোভাব তার তুলনায় এটা কিছুই নয়।" কালো চামড়ার নিগ্রোরা জাতি হিসেবেই নিকৃষ্ট এরকম একটা কথা আমেরিকায় অনেকে, এমনকি অনেক সমাজ বিজ্ঞানীও চালাতে চেষ্টা করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বললেন - "গ্রীকদেরও ক্রীতদাস ছিল। তারা নিগ্রো নয় ছিল শ্বেতকায় যুদ্ধবন্দীর দল। অথচ তাদের সম্বন্ধে মনীষী অ্যারিস্টটল বলেছিলেন যে তারা নিকৃষ্ট শ্রেণীর জীব, তাদের পরাধীন এবং পদানত থাকাটাই সমীচীন।"

যুদ্ধ এবং সামরিক মনোবৃত্তির প্রতি তাঁর বিতৃষ্ণা ছিল অত্যন্ত তীব্র। অধিকাংশ বাচ্চারই সামরিক ইউনিফর্ম, ব্যান্ডের আওয়াজ বা শ্রেণীবদ্ধ কুচকাওয়াজের প্রতি একটা আকর্ষণ থাকে। অথচ আইনস্টাইন ছোটবেলা থেকেই ভীষণ অপছন্দ করতেন এইসব। স্কুলের কঠোর নিয়মকানুন তাঁর ভালো লাগত না - "মাস্টারদের মনে হত মিলিটারি সার্জেন্টদের মত"। বহুবারই যুদ্ধবিরোধী জনসভা, মিছিল বা প্রচারাভিযানে যোগ দিয়ে তিনি তাঁর এই মনোভাব জনসমক্ষে ব্যক্ত করেছেন। ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে এই মানুষটির নামই জড়িয়ে পড়ল ইতিহাসের বীভৎসতম মারণাস্ত্রের সঙ্গে। হিরোশিমা নাগাসাকির ঘটনার পর আইনস্টাইন যতদিন বেঁচেছিলেন ততদিন বোধহয় কিছুতেই ভুলতে পারেননি যে যত পরোক্ষ এবং অনভিপ্রেত ভাবেই হ'ক এই ধ্বংসের দায়ভাগে তিনিও অংশীদার। তাই সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিলেন যুদ্ধবিরোধী শান্তি আন্দোলনে। তাঁর সমকালের আরেক মনীষী বার্টাও রাসেলও এই সময় পারমাণবিক যুদ্ধের ভয়ঙ্করতা সম্বন্ধে বিশ্ব জনমত জাগিয়ে তোলার কাজে উদ্যোগ নেন। তিনি একটি ঘোষণাপত্রের খসড়া তৈরি করে পৃথিবীর কয়েকজন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকের কাছে পাঠান তাঁদের অনুমোদন ও স্বাক্ষরের জন্য। রাসেলের পরিকল্পনা ছিল বিভিন্ন দেশের এবং বিশেষতঃ কমিউনিস্ট ও অকমিউনিস্ট এই দুই গোষ্ঠীর বৈজ্ঞানিকদের এই ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করাবেন। বলা বাহুল্য আইনস্টাইনের নাম ছিল তালিকার সবচেয়ে ওপরে। ১৯৫৫ সালের ১৮ই এপ্রিল রাসেল প্লেনে ক'রে প্যারিস যাচ্ছেন এই

ঘোষণাপত্রের ব্যাপারেই জোলিও কুরীর সঙ্গে কথা বলতে। হঠাৎ শুনলেন ঘোষণা "এইমাত্র খবর পাওয়া গেল বিশ্ববিশ্রুত বৈজ্ঞানিক অ্যালবার্ট আইনস্টাইন লোকান্তরিত হয়েছেন"। রাসেল তাঁর আত্মজীবনীতে লিখছেন যে খবরটা শুনে তাঁর দুটো ধাক্কা লাগল। প্রথমটা আইনস্টাইন আর নেই বলে। দ্বিতীয়টা এইজন্য যে আইনস্টাইনের কাছ থেকে তখনও তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাক্ষর পাননি। তাঁর স্বাক্ষর না পেলে পুরো উদ্যোগটাই ব্যর্থ। প্যারিসে হোটেলে পৌঁছে রাসেল দেখেন তাঁর জন্য একটা চিঠি অপেক্ষা করছে সেখানে। দু-তিন লাইনের ছোট্ট একটা চিঠি - ১১ই এপ্রিল লেখা, আইনস্টাইন সম্মতি দিয়েছেন। এটাই অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের সর্বশেষ সামাজিক কৃত্য। পরে তাঁর স্বাক্ষরবাহী ঘোষণাপত্রটি 'রাসেল-আইনস্টাইন ঘোষণাপত্র' নামে বিশ্বের মানুষের কাছে পরিচিত হয়।

এতো গেল বৃহত্তর সামাজিক সচেতনতার দিক - বিবেকবুদ্ধি, কর্তব্যবোধ ও যুক্তি বিশ্লেষণ মানুষকে যে চৈতন্যে উপনীত করে। কিন্তু অত্যন্ত ব্যক্তিগত ক্ষেত্রেও পাশের মানুষদের প্রতি তাঁর হৃদয়ের স্বতঃস্ফূর্ত মানবিক দরদ সকলকে খুব গভীরভাবে স্পর্শ করত।

এমনিতে ছবি তুলতে দিতে চাইতেন না—কেউ যদি এসে বলত ছবিটা তুলতে দিলে ফটোগ্রাফারের কিছুটা আর্থিক সুবিধা হয় তক্ষুনি রাজী। অটোগ্রাফ দিতেন এই শর্তে যে প্রাপককে কিছু অর্থ কোন একটি দুর্গত পরিবারকে দিতে হবে। নিজে বিজ্ঞানের জগতে প্রবেশের মুখে খুব রুঢ় আঘাত পেয়েছিলেন তৎকালীন প্রতিষ্ঠিত বৈজ্ঞানিকদের কাছ থেকে। কিন্তু পরিবর্তে তিনি যখন প্রতিষ্ঠিত তখন অকুণ্ঠ সাহায্য করেছেন নতুন উদীয়মান বিজ্ঞান কর্মীদের। অপরিচিত সত্যেন্দ্রনাথকে কি সমাদরে তিনি বরণ করে নেন সে কথা তো সকলেরই জানা। এ প্রসঙ্গে লিওপোল্ড ইনফেল্ডের নামও উল্লেখ করা উচিত। এই পোলিশ পদার্থ বিজ্ঞানী ইহুদী বিদ্বেষের শিকার হয়ে দেশ ছেড়ে পালান। বহু জায়গায় ঘুরে শেষে আইনস্টাইনের আবাস প্রিন্সটনে আসেন। একটি ফেলোশিপ পেয়ে তাঁর কাছে কাজও করেন এক বছর। কিন্তু আশ্চর্যের কথা হ'লো আইনস্টাইনের নিজের সুপারিশ থাকা সত্ত্বেও দ্বিতীয় বছরের জন্য তাঁর ফেলোশিপ অনুমোদিত হয় না। অথচ কিছু টাকা ছাড়া তাঁর পক্ষে কাজ চালানো অসম্ভব। এই সমস্যার কথা শুনে আইনস্টাইন তাঁকে যে সমাধান বাতলালেন তা শুনে যে কেউ চমকে যাবেন, ইনফেল্ড নিজে তো গিয়েইছিলেন। তিনি বললেন, "আমি যা পাই তার থেকে ফেলোশিপের সমপরিমাণ অর্থ আমি তোমাকে দেব, তুমি কাজ চালিয়ে যাও"। কৃতজ্ঞতায় অভিভূত হলেও ইনফেল্ড অবশ্য এইভাবে অর্থ গ্রহণ করতে পারেন নি। তিনি অন্য পথে সমস্যার সমাধান করলেন। আইনস্টাইনের সঙ্গে একযোগে একটা বই লেখার পরিকল্পনা করে একজন প্রকাশকের কাছ থেকে সেই বাবদ আগাম টাকা যোগাড় করলেন। সেই টাকাতেই তাঁর ঐ সময়কার খরচ চলল। বইটি প্রকাশিত হয় "The Evolution of Physics" নামে। আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের ধারণাগুলির ক্রমবিকাশের এমন স্বচ্ছ সুন্দর চিত্র খুব কম বইতেই আঁকা আছে। বইটির বিষয়বস্তুর মূল ধারণার অধিকাংশই আইনস্টাইনের ভাবনার

ফল কিন্তু লেখার পরিশ্রমের সবটাই করেছিলেন ইনফেল্ড নিজে।

তাই দেখা যাচ্ছে গণিত ও পদার্থবিদ্যার তুরীয় মার্গে বিহার করতে গিয়ে আশপাশের মানুষজনের প্রতি উদাসীন হয়ে পড়েনি আইনস্টাইন।

একদিকে নৈর্ব্যক্তিক অনাসক্তি অন্যদিকে মানুষের প্রতি অসীম দরদ—এই দুটি পরস্পর বিরোধী ভাব কি করে একই মানুষের মধ্যে সহাবস্থান করে তার খুব সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়েছেন লিওপোল্ড ইনফেল্ড, তাঁর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ “Quest”-এ। তিনি লিখছেন: *“Einstein is the kindest, most understanding and helpful man in the world. But again this some what common place statement should not be taken literally; the feeling of pity is one of the source of human kindness. Pity for the fate of our fellow men, for the misery around us, for the suffering of human beings stirs our emotion by the resonance of sympathy. Our own attachment to life and people, the ties which bind us to the outside world, awaken our emotional response to struggle and suffering outside ourselves. But there is also another entirely different source of human kindness. It is the detached feeling of duty based on aloof, clear reasoning. Good, clear thinking leads to kindness and loyalty because this is what makes life simpler, fuller, richer, diminish friction and unhappiness in our environment and therefore also in our lives. A sound social attitude, helpfulness, friendliness, kindness may come from both these different sources, to express it anatomically from the heart and brain.”*

নৈর্ব্যক্তিক মনন এবং মানবিক দরদ এই দুইয়েরই উৎস যদি হয় মস্তিষ্ক তাহলে তাদের মধ্যে আর দ্বন্দ্ব থাকে না। আইনস্টাইনের মত বিশাল মাপের মানুষদের কথা ভাবতে গেলে এইরকম মনে হওয়া খুবই স্বাভাবিক যে দৈনন্দিন যে সব সাংসারিক দুঃখবেদনায় আমাদের মত ছোট মাপের মানুষেরা ক্লিষ্ট হয় সেগুলি নিশ্চয় এই উর্দ্ধলোকচারী মহামানবদের সম্পূর্ণই এড়িয়ে যায়। তাঁদের কর্ম ও সাধনার মত তাঁদের সমস্যা, দুঃখকষ্টগুলিও খুব বড়ো মাপের। এমনকি কখনও কখনও এমন রাগও তো হয় যে যত মহৎ দুঃখ বেদনা ইতিহাসের নায়করা ভাগটাগ করে নিয়ে অমর হয়ে আছেন, আর আমাদের জন্য উচ্ছিষ্ট পড়ে আছে কিছু হীন, গৌরবহীন দুঃখেরা। আইনস্টাইনের জীবন কিন্তু অন্য কথা বলে।

তুচ্ছ, ক্ষুদ্র অপমান দুঃখেরা আইনস্টাইনকে ছেড়ে দেয়নি। জুরিখ পলিটেকনিক থেকে পাশ করে বেরোনোর পর দীর্ঘকাল তাঁকে এক অসহায় কর্মহীন অবস্থার মধ্যে কাটাতে হয়।

পরীক্ষায় বিশেষ ভালো ফল করা সত্ত্বেও তাঁর নিজের পলিটেকনিকে গবেষণার সুযোগ পেলেন না। বহু চেষ্টা করেও কোনও বিদ্যায়তনে শিক্ষকতার কাজ পাচ্ছেন না — বন্ধু গ্রসমান্-কে লিখছেন (এপ্রিল, ১৯০২): “গত তিন সপ্তাহ ধরে বাবা-মা’র কাছে ছিলাম। পুরো সময়টা জুড়েই কোনও একটা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতার কাজ খুঁজেছি। আমি নিশ্চিত যে বহু আগেই এ ধরনের একটা কাজ আমি পেয়ে যেতাম যদি না ওয়েবার (Weber) এর ক্রোধ আমার বিরুদ্ধে কাজ করত। যাই হ’ক আমি কোনও সম্ভাব্য সুযোগই নষ্ট করছি না। আর তাছাড়া রসবোধটাও

পুরোপুরি খোয়ানি এখনও—ভগবান যখন গর্দভের সৃষ্টি করেছিলেন তখন তাকে চামড়াটা বেশ মোটাই দিয়েছিলেন।”

এই ওয়েবার ছিলেন ওঁর পলিটেকনিকের মাস্টারমশাই। আইনস্টাইন ওঁর ক্লাস টাস করতেন না, একবার নাকি Herr Professor না বলে Herr Weber বলে ফেলেছিলেন। এই হ'ল ক্রোধের কারণ। অম্লান রসবোধের আড়ালে কিন্তু আইনস্টাইনের কষ্টভোগটা চোখ এড়ায় না। এই সময়কার হতাশা ও মনোকষ্টের একটা স্পষ্ট ছবি পাওয়া যায় তাঁর পিতা হেরমান আইনস্টাইনের সেসময়ে লেখা একটি চিঠিতে যেটি তিনি লিখেছিলেন প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ভিলহেল্ম অসটওয়ালডকে। চিঠিটা এইরকম — প্রিয় অধ্যাপক মহাশয়, আপনাকে এভাবে সরাসরি চিঠি লেখার জন্য মার্জনা করবেন, শুধুমাত্র নিজের ছেলের মঙ্গলের কথা ভেবেই আমি এই কাজ করার সাহস পেয়েছি। প্রথমেই বলে রাখি, আমার ছেলে অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের বয়স ২২ বছর, সে জুরিখ পলিটেকনিকে চার বছরের পাঠ্যক্রম শেষ করে গত গ্রীষ্মে খুব কৃতিত্বের সঙ্গে পদার্থবিদ্যা ও গণিতে ডিপ্লোমার পরীক্ষায় পাশ করেছে। তারপর থেকে সে একটি এ্যাসিস্টেন্ট পদ লাভের জন্য বছবার চেষ্টা ক'রে ব্যর্থ হয়েছে। এ্যাসিস্টেন্টশিপ পেলে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক পদার্থবিজ্ঞানের চর্চা চালিয়ে যাওয়া তার পক্ষে সম্ভব হত। কিন্তু তা সে পায় নি। (মানুষকে) একটু বিচার করে দেখার ক্ষমতা যাঁদের আছে তাঁরা সবাই ওর প্রশংসা করেন, এবং আমি আপনাকে নিশ্চিত বলতে পারি যে অ্যালবার্ট অত্যন্ত একাগ্রমনা অধ্যবসায়ী ছেলে এবং নিজের বিষয়টিকে সে অত্যন্ত ভালবাসে।

বর্তমানের এই কর্মহীনতা আমার ছেলেটির মনে এক গভীর বিষণ্ণতার সৃষ্টি করেছে, প্রতিদিনই এই ধারণা তাঁর মনে গেড়ে বসছে যে সে নিজের কেরিয়ার গড়ার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ এবং জীবনে কোনোদিনই এর থেকে বেরিয়ে যাবার পথ সে ফিরে পাবে না। এর ওপর ও আরও মনমরা হয়ে পড়ছে এই ভেবে যে সে বুঝি আমাদের পক্ষে একটা ভারের মত হয়ে পড়ছে — কেননা আমাদের অবস্থা খুব ভালো নয়।

প্রিয় অধ্যাপক মহাশয়, বর্তমানকালের পদার্থবিজ্ঞানীদের মধ্যে আমার ছেলে আপনাকে বিশেষ শ্রদ্ধা ও সম্মান করে বলেই আমি আপনার কাছে একটি অনুরোধ জানাচ্ছি—‘আনালেন ডের ফিসিক’ (Annalen der Physik) পত্রিকায় ওর লেখা প্রবন্ধটি যদি আপনি অনুগ্রহ করে পড়েন এবং সম্ভব হলে, তাকে উৎসাহ দিয়ে দু-এক ছত্র লেখেন তাহলে হয়ত সে আবার কাজ করার এবং বেঁচে থাকার স্বাভাবিক আনন্দটুকু ফিরে পায়। আর যদি এর সঙ্গে এখন বা আগামী শরৎকালে তার জন্য একটি এসিস্টেন্টের কাজ যোগাড় করে দেওয়া আপনার পক্ষে আদৌ সম্ভব হয় তাহলে এই পিতার কৃতজ্ঞতার আর সীমা থাকে না। নিজের ধৃষ্টতার জন্য আরেকবার ক্ষমা প্রার্থনা করে শুধু এটুকুই আপনাকে জানাতে চাই যে আমার ছেলে কিন্তু এই অস্বাভাবিক চিঠি লেখার ব্যাপারে কিছুই জানে না।”

[Banesh Hoffman : Albert Einstein—Creator and Rebel, Paladin, new edn 1975]

এ চিঠি পেয়ে অসটওয়ালড অ্যালবার্টকে চিঠি লিখেছিল কিনা জানা যায় না কিন্তু কোনও এ্যাসিসটেন্টশিপ যে তিনি পান নি — এটা নিশ্চিত। শেষ অবধি বন্ধু গ্রসমানের বাবার সুপারিশে বার্ণের সুইস পেটেন্ট অফিসেই তাঁর প্রথম চাকরি জোটে। সে গল্পতো অনেকেরই জানা — কিন্তু আমরা যেটা লক্ষ্য করতে চাই সেটা হ'ল এই যে সদ্য-স্নাতক আইনস্টাইনকে যে সব সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল - হীনমনা দার্শনিক শিক্ষকের শত্রুতা থেকে বেকারী অবধি - সেগুলোর সঙ্গে কিন্তু আমাদের সময়ে এই ভারতের এক সদ্য-স্নাতক বিজ্ঞান ছাত্রের সমস্যার খুব একটা অমিল নেই। দুজনের মধ্যে দেশ ও কালের যতই ফারাক থাক অভিন্ন সমস্যা ও দুঃখভোগের ঐক্যে তারা একই সাথে বাঁধা পড়ে এবং আইনস্টাইন যেন হয়ে পড়েন খুব পরিচিত কাছের লোক। প্রিন্সটনের দ্বাররক্ষকের মত আমাদেরও বলতে ইচ্ছে করে যে, না, আমরা একা নই।

কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না এই সমস্যার কাছে তিনি কোনদিন আত্মসমর্পণ করেন নি, বাঁধা পড়ে যাননি। বার বার মুক্তি খুঁজে নিয়েছেন অন্য এক আকাশে — যার দিশা পাওয়া যায় আইনস্টাইনের *Autobiographical Notes* -এর এই কটি লাইনে:

"Out yonder was this huge world which exists independently of us human beings and which stands before us like a great eternal riddle, at least partially accessible to our inspection and thinking. The contemplation of this world beckoned like a liberation and I soon noticed that many a man whom I have learned to esteem and admire had found inner freedom and security in devoted occupation of it.....The road to this paradise was not a comfortable and alluring as the road to the religious paradise. But it has proved itself as trustworthy and I have never regretted having chosen it."

তথ্যসূত্র:

এই প্রবন্ধে ব্যবহৃত অধিকাংশ তথ্য আইনস্টাইনের নিম্নে উল্লিখিত বইগুলি থেকে আহরিত:

- The World as I See It: প্রথম প্রকাশ 1935 সনে
- Autobiographical Notes: প্রথম প্রকাশ 1949 সনে
- Out of My Later Years: প্রথম প্রকাশ 1950 সনে
- Ideas and Opinions: প্রথম প্রকাশ 1954 সনে

বইগুলির প্রথম সংস্করণ আজ আর সহজলভ্য নয়। কিন্তু পরবর্তী কালে ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশক নতুন সংস্করণে এগুলি প্রকাশ করেছেন। সেই সংস্করণগুলি অল্প আয়াসেই সংগ্রহ করা যায়।

[লেখাটি পরিবর্তিত আকারে পুনর্মুদ্রিত]

স্মরণে সত্যেন্দ্রনাথ

– ডঃ সমাপ্তি পাল, অধ্যাপিকা

আজ থেকে ১২৫ বছর আগে, ১৮৯৪ সালের ১লা জানুয়ারী, আমাদের এই কলকাতা শহরে জন্ম হয়েছিল অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বোসের। পরাধীন ভারতবর্ষে তখন বইছে প্রবল জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ঢেউ। তিনি তাই ছেলেবেলা থেকেই নানাভাবে জাতীয় ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। তিনি বলতেন “পরাধীনতার গ্লানিই আমার বিজ্ঞান চর্চার বোধন।”; মনে করতেন, বিজ্ঞানের তাত্ত্বিক দিক নিয়ে চর্চা করে বিদেশীদের সমকক্ষ হয়ে ওদের সঙ্গে লড়াইতে হবে। তাই তিনি বিজ্ঞান নিয়ে পড়ার সিদ্ধান্ত নেন, যদিও ভাষা ও সাহিত্যে তাঁর সহজাত দক্ষতাও কিছু কম ছিল না।

হিন্দু স্কুলের মাস্টারমশাই টেস্ট পরীক্ষায় অঙ্কে তাঁকে ১০০-য় ১১০ দিয়েছিলেন, কারণ প্রশ্নপত্রে এগারটি প্রশ্নের মধ্যে দশটির উত্তর করার কথা বলা থাকলেও সত্যেন্দ্রনাথ এগারটিরই সঠিক উত্তর দিয়েছিলেন; উপরন্তু জ্যামিতির এক্সট্রা দু-তিন রকমভাবে কষে দেখিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে বি.এস্.সি. এবং এম.এস্.সি.-তে তিনি প্রথম হন, এর মধ্যে এম.এস্.সি.-তে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রেকর্ড নম্বর পেয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে সহপাঠী বন্ধু মেঘনাদ সাহা হতেন দ্বিতীয়।

সত্যেন্দ্রনাথ মোট ২৪টি গবেষণাপত্র লিখেছিলেন, যার মধ্যে প্রথমটি প্রকাশিত হয় ১৯১৮ সালে ফিলজফিক্যাল ম্যাগাজিনে এবং শেষেরটি ১৯৫৫ সালে। প্রথম গবেষণাপত্রে তাঁর সহ-রচয়িতা ছিলেন বন্ধু মেঘনাদ সাহা। যে বিখ্যাত গবেষণাপত্রটি তাঁকে বিশ্বের দরবারে অমর করে রেখেছে সেটি কিন্তু ফিলজফিক্যাল ম্যাগাজিন কর্তৃপক্ষ প্রকাশ করতে সম্মত হননি। সত্যেন্দ্রনাথ তখন সেটিকে আইনস্টাইনের কাছে পাঠান এবং তাঁর মতামত জানতে চেয়ে লেখেন -

PHYSICS DEPARTMENT
Dacca University
Dated the 4th June
1924

Respected Sir

I have ventured to send you the accompanying article for your persual and opinion. I am anxious to know what you think of it. You will see that I have tried to deduce the coefficient $8\pi v^2 / c^3$ in Plank's law independent of the classical electrodynamics, only assuming that the ultimate elementary regions in the phase-space has the content h^3 . I do not know sufficient German to translate the paper. If you think the paper worth publication I shall be grateful if you arrange for its publication in Zeitschrift fur Physik. Though a complete stranger to you, I do not

feel any hesitation in making such a request. Because we are all your pupils though profiting only by your teachings through your writings. I do not know whether you still remember that somebody from Calcutta asked your permission to translate your papers on Relativity in English. You acceded to the request. The book has since been published. I was the one who translated your paper on Generalised Relativity.

Yours faithfully
S. N. Bose

গবেষণাপত্রটি আইনস্টাইনের এত ভাল লেগেছিল যে তিনি নিজে সেটি জার্মান ভাষায় অনুবাদ করে *Zeitschrift fur Physik* (vol 26, 178-181, 1924) পত্রিকায় প্রকাশের ব্যবস্থা করেছিলেন এবং নিবন্ধের পাদটীকায় এর প্রশংসা করে যা লিখেছিলেন তার বাংলা অনুবাদটি এরকম – “আমার মতে, বোসের প্লাঙ্কের সূত্র প্রমাণ একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এখানে ব্যবহৃত পদ্ধতির দ্বারা আদর্শ গ্যাসের কোয়ান্টাম তত্ত্বও পাওয়া যায়, যা আমি অনত্র আলোচনা করব।” তবে অনুবাদ করার সময় আইনস্টাইন সত্যেন্দ্রনাথের নিবন্ধের একটি মৌলিক ধারণার কিছু পরিবর্তন করেন। আলোককণিকার স্পিনের জায়গায় তিনি সমবর্তন কথাটির উল্লেখ করেন। পরে প্রমানিত হয়েছে যে আলোককণিকা ও অন্যান্য বস্তুকণিকাদেরও একটি স্বভাবজাত স্পিন আছে। সত্যেন্দ্রনাথ যে ফোটন স্পিনের কথা সেসময় বলেছিলেন তা সি. ভি. রমন ও এস. ভাগবন্তমের লেখা থেকে জানা যায়। কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথ কোনোদিনই দাবী করেননি যে তিনিই স্পিনের আবিষ্কর্তা, আইনস্টাইনকেও সেব্যাপারে কিছু জানাননি।

সত্যেন্দ্রনাথের এই গবেষণাপত্রটির বিষয়বস্তু বিজ্ঞানজগতে আলোড়ন সৃষ্টি করে, জন্ম হয় বোস-আইনস্টাইন স্ট্যাটিসটিক্স-এর, যা এখন বোস স্ট্যাটিসটিক্স নামে পরিচিত, আর যেসব কণা বোস স্ট্যাটিসটিক্স মেনে চলে তারা বোসের নামানুসারে ‘বোসন’ নামে খ্যাত।

২রা জুলাই, ১৯২৪, আইনস্টাইন সত্যেন্দ্রনাথের চিঠির উত্তর দিয়ে একটি পোস্টকার্ড পাঠান যাতে তিনি লিখেছিলেন, “I have translated your paper and given it to *Zeitschrift fur Physik* for publication. It signifies an important step forward and pleases me very much.” বোসের জীবনে আইনস্টাইনের লেখা এই পোস্টকার্ডটির গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। এই পোস্টকার্ডটির দৌলতেই তিনি ইউরোপে যাওয়ার জন্য দু’বছরের স্টাডি-লিভ পেয়েছিলেন, যার জন্য প্রায় ছমাস আগে কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করেও কোন সাড়া পাচ্ছিলেন না। তিনি বলেছিলেন – “That little thing (Einstein’s postcard) gave me a sort of passport for the study leave ...”। আবার এই পোস্টকার্ড দেখিয়েই তিনি জার্মান কনসুলেটের কাছ থেকেও ভিসা পেয়েছিলেন।

প্রথম চিঠি পাঠানোর এগারো দিনের মাথায়, প্রথম চিঠির উত্তর আসার আগেই সত্যেন্দ্রনাথ দ্বিতীয় একটি গবেষণাপত্রও আইনস্টাইনের কাছে পাঠিয়েছিলেন জার্মান ভাষায় অনুবাদ করে ঐ একই পত্রিকায় প্রকাশের ব্যবস্থা করার জন্য। সঙ্গে চিঠিটি ছিল এরকম –

Physics Laboratory
Dacca University
Dacca, India
15th June, 1924

Respected Master

I send herewith another paper of mine for your kind perusal and opinion. I hope my first paper has reached your hands. The result to which I have arrived seems rather important (to me at any rate). You will see that I have dealt with the problem of thermal equilibrium between Radiation and Matter in a different way, and have arrived at a different law for the probability for elementary particles, which seems to have simplicity in its favour. I have ventured to send you the type-written paper in English. It being beyond me to express myself in German (which will be intelligible to you), I shall be glad if its publication in Zeitschrift fur Physik or any other German Journal can be managed. I myself know not how to manage it. I shall be grateful if you express your opinion on the papers and send it to me at the above address.

Yours truly
S. N. Bose

১৯২৪ সালেই Zeitschrift fur Physik (vol 27, 383-393, 1924) পত্রিকায় সত্যেন্দ্রনাথের দ্বিতীয় গবেষণাপত্রটিও প্রকাশিত হয়। তবে এই নিবন্ধের বক্তব্যের সঙ্গে আইনস্টাইন সম্পূর্ণ একমত হতে পারেননি এবং নিবন্ধের পাদটীকায় সেকথা উল্লেখ করেছিলেন। ফলে গবেষণাপত্রটি তেমন গুরুত্ব লাভ করতে পারেনি। পরবর্তীকালে আইনস্টাইনের সঙ্গে যখন সত্যেন্দ্রনাথের দেখা হয়েছিল তখন তাঁদের মধ্যে এই বিষয়ে অনেক আলোচনা হয়েছিল কিন্তু তাঁরা একমত হতে পারেননি। যদিও সত্যেন্দ্রনাথের কাছে দ্বিতীয় গবেষণাপত্রটি ছিল বেশি গুরুত্বপূর্ণ এবং তিনি আশাবাদী ছিলেন যে ভবিষ্যতে নিবন্ধটি তার প্রাপ্য মর্যাদা পাবে।

এরপর আরও একটি গবেষণাপত্র সত্যেন্দ্রনাথ আইনস্টাইনের কাছে পাঠিয়েছিলেন যেটি কোন গুরুত্বই পায়নি। এটির কোন কপিও আর পাওয়া যায় না। এটিতে তিনি শূন্যগর্ভ তরঙ্গের কথা বলেছিলেন এবং আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদের সঙ্গে এর একটি সম্পর্ক অনুমান করেছিলেন। তাঁর মতে কোয়ান্টাম তত্ত্ব ও একীভূত ক্ষেত্রতত্ত্বের মধ্যে সামঞ্জস্য বজায় রাখতে গেলে শক্তির প্রবাহ ও তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গ প্রবাহকে পৃথকভাবে ভাবা দরকার। পরবর্তীকালে শ্রোয়েডিঙ্গারকে আইনস্টাইন একটি চিঠি লেখেন যা থেকে জানা যায় আইনস্টাইন

এই মত মেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু সেই চিঠিতে বোসের চিঠির বা তাঁর তৃতীয় প্রবন্ধের কোন উল্লেখ নেই।

১৯২৪ সালে শুরু হয় সত্যেন্দ্রনাথের বিদেশ যাত্রা। সেপ্টেম্বরে জাহাজে যাত্রা শুরু করে তিনি প্যারিসে পৌঁছান ১৮ই অক্টোবর। ২৬শে অক্টোবর আইনস্টাইনের কাছে কাজ করার ইচ্ছে প্রকাশ করে তাঁকে একটি চিঠি লেখেন। এটির উত্তরও তিনি পেয়েছিলেন, কিন্তু তাতে আইনস্টাইনের কাছে কাজ করার বিষয়ে কোন উল্লেখ ছিল না, বা এতবড় একটি প্রতিভার বিকাশের জন্য কোন পথনির্দেশিকাও ছিল না। এতে সত্যেন্দ্রনাথ খুবই হতাশ হয়েছিলেন। আইনস্টাইনকে তিনি গুরু মানতেন। অনেকে মনে করেন গুরু আইনস্টাইন শিষ্য সত্যেন্দ্রনাথকে যথাযথ স্থানে প্রতিষ্ঠা করেননি। কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর গুরুভক্তির কারনেই তৃতীয় নিবন্ধটি অন্য কোথাও প্রকাশের জন্য পাঠাননি, যদিও বিজ্ঞানী Langevin এটিকে অতি মূল্যবান এবং প্রকাশের উপযোগী বলে মন্তব্য করেছিলেন (আইনস্টাইনকে পাঠানোর আগে তিনি এটি Langevin কে দেখিয়েছিলেন)।

ডিরাক সাহেবের (P.A.M Dirac) উদ্যোগে বোস রয়্যাল সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত হন। ডিরাক সাহেব তাকে বলেছিলেন যে তিনি যদি পদার্থবিজ্ঞানের নোবেল কমিটির (যারা সবাই ডিরাকের বন্ধুস্থানীয়) অন্ততঃ দুজনকে নোবেল পুরস্কারের জন্য তাঁর নাম সুপারিশ করতে সম্মত করতে পারেন তাহলে নোবেল পাওয়া কঠিন হবে না। সত্যেন্দ্রনাথ এই প্রস্তাব শুনে বলেছিলেন “পুরস্কার পাওয়ার লোভে নিজের জন্য ক্যানভাস করতে রাজী নই। যা পেয়েছি তাতেই আমি সন্তুষ্ট।” – এরকম আত্মমর্যাদাবোধ অনুসরণযোগ্য।

সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন সত্যিকারের বিজ্ঞান সাধক। তিনি বলতেন - “ ভগবান এবং শয়তান সবই বুঝলি আমাদের মনগড়া।” বলতেন – “ ভগবান তত্ত্ব সম্পর্কে আমার জানার ব্যক্তিগতভাবে কোন আগ্রহ নেই। আমরা যখন ল্যাবরেটরিতে বসে কাজ করি বা কাগজ কলম নিয়ে আঁক কষি, তখন কি একবারও ভাবি ভগবান এসব করিয়ে দিচ্ছে। তাহলে তো আমার কোন অস্তিত্বই থাকে না।” তিনি বলতেন - “ মানুষকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে শিক্ষিত করে তোলার ব্রত নাও - আমি একজনকে অন্ততঃ শিক্ষিত করব। শিক্ষিত বলতে শুধু মাত্র অক্ষরজ্ঞান নয়। তার বিবেকের জ্ঞানের পর্দাটা একটু তুলে ধর। একেই বলে কাজ। এরই নাম সাধনা।”

পত্রিকার স্বল্প পরিসরে সত্যেন্দ্রনাথ বোসের অসামান্য জীবনকথার পূর্ণ পরিচয় দেওয়া সম্ভব নয়। তাঁর জীবনের কিছু কথা ও আদর্শ, যা ছাত্রছাত্রীদের জীবনে চলার পথে পাথেয় হতে পারে, তা তুলে ধরার চেষ্টা করলাম। তাঁর জীবনের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে এগিয়ে চলাই হবে ১২৫তম জন্মবার্ষিকীতে তাঁর প্রতি আমাদের শ্রদ্ধার্ঘ্য।

Experience of C. K. Majumdar memorial workshop on experimental physics

– সায়ক ঘোষ ও শুভদীপ দে, প্রথম বর্ষ

পদার্থবিদ্যার প্রতি আগ্রহ থাকায় সিটি কলেজে পদার্থবিদ্যা বিষয়ে স্নাতক স্তরে ভর্তি হই। পড়া চালু করেছি, নিয়মিত কলেজে আসছি, এমতাবস্থায় একদিন কলেজে মাননীয়া অধ্যাপিকা সমাপ্তি পালের কাছে শুনলাম ৪ থেকে ১০ ডিসেম্বর, ২০১৭ Experimental Physics-এর উপরে একটি Workshop হবে কলকাতার ভবানীপুর এডুকেশন সোসাইটি কলেজে, উক্ত কলেজ এবং IAPT (Indian Association of Physics Teachers) -এর উদ্যোগে। আমরা কয়েকজন বন্ধু মিলে নতুন কিছু শেখার আশায় apply করি Email মারফত। উৎসাহ কয়েক গুণ বেড়ে যায় Email-এর মাধ্যমে Workshop- এ যোগদানের ছাড়পত্র পেয়ে। আমাদের



কলেজের পদার্থবিদ্যা বিভাগের তরফ থেকে আমরা তিন বন্ধু অর্থাৎ আমি, শুভজিৎ এবং শুভদীপ নির্দিষ্ট সময়ে ভবানীপুর এডুকেশন সোসাইটি কলেজে গিয়ে উক্ত অনুষ্ঠানে যোগদান করি। সূচনাপর্বে Inaugural Speech দেন আমাদের কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপক মাননীয় ভূপতি চক্রবর্তী। Inaugural Talk প্রদান করেন SAHA INSTITUTE OF NUCLEAR PHYSICS-এর



“RAJARAMANNA FELLOW” শ্রী নব কুমার মন্ডল মহাশয়। ‘Particle Physics’-এর উপরে তার Speech খুবই আকর্ষণীয় এবং মনোগ্রাহী ছিল। এরপর বিভিন্ন কলেজ থেকে আগত ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে আমাদের বিভিন্ন দলে ভাগ করে বিভিন্ন ধরনের Experiment করতে দেওয়া হয় যেগুলি সম্পর্কে আমরা কেউই অবগত ছিলাম না। ঐ Experiment-গুলি করার সময় আমরা Physics-কে নতুন করে চিনতে ও ভাবতে শিখলাম। ঐ তিন দিন উক্ত অনুষ্ঠানে আগত শ্রদ্ধেয় অধ্যাপকগণ এবং ঐ কলেজের দ্বিতীয়

বর্ষের দাদারা Experiment-এর সময় আমাদের নানা ভাবে সাহায্য করে। তিন দিন ধরে নানা Experiment করার পর অবশেষে 10ই ডিসেম্বর IAPT-এর মাননীয় সদস্যবৃন্দ আমাদের উদ্দেশ্যে তাদের মূল্যবান বক্তব্য রাখেন যাতে আমাদের পদার্থবিদ্যার প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। Workshop-এ যোগদানের স্বীকৃতি স্বরূপ সকল ছাত্র-ছাত্রীদের শংসাপত্রও প্রদান করা হয়। এই অনুষ্ঠানে যোগদানের সুযোগ করে দেওয়ার জন্য আমরা সিটি কলেজের পদার্থবিদ্যা বিভাগের কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকব এবং আমরা IAPT এবং ভবানীপুর এডুকেশন সোসাইটি কলেজকেও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি এই অনুষ্ঠান আয়োজন করার জন্য। যদি আগামী বছর আমাদের কলেজে এই Workshop-টির আয়োজন করা হয় তাহলে আমরা আরও খুশি হব এবং আমরা এই Workshop-এর উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

Departmental SEMINAR 2018 (4th January)



Speakers:

1. Dr. Partha Goswami (Ex. student)
2. Mr. Tanmoy Sen (Ex. student)

আমরা হলো...Team of Focus

– বাসবদত্তা চক্রবর্তী, প্রথম বর্ষ

আজ কলেজে গিয়ে শুনলাম magazine-এ নাকি মাত্র চারটি লেখা জমা পরেছে। অরিত্র আমাকে খুব একটা বকাঝকা দিয়ে বলল – “কি রে? দু-কলম লিখতে তো পারিস; নইলে যে magazine-টা Wall-magazine-এ পরিণত হবে।” মনে মনে ভাবলাম লিখবটা কি? সাহিত্যে আমার অবস্থা শুনলে সমাজ আমায় কর্ণ করবে। রাত্রিবেলা Quantum Physics-এর বইটা নাড়াচাড়া করতে করতে হঠাৎ মাথায় একটা চিন্তা এল, ‘আচ্ছা, আমাদের ‘FOCUS’-এর তো প্রায় এক বছর হয়ে গেল। সেই স্মৃতিটাই একটু রোমন্থন করা যাক।’ এই ‘FOCUS’-এর গুরু দায়িত্বটা ছিল আমাদের প্রথম বর্ষের ছাত্রছাত্রীদের ওপর। আমার জীবনে এই প্রথম দেখা এত বড় Reunion Programme। শুধু আমার না, আমার মতো আরও অনেকের কাছে এটাই প্রথম।

খুব কম সময়ের মধ্যে আমরা অনুষ্ঠানটা সাজিয়ে তুলেছিলাম। আর আমাদের এই অনুষ্ঠানটা সাজিয়ে তুলতে যে মানুষটি আমাদের সবথেকে বেশি ইন্ধন জুগিয়েছিলেন তিনি হলেন আমাদের S.P. Maam। তিনি না থাকলে আমরা কিছুই করতে পারতাম না, চোখে সরষে ফুল দেখতাম। এই অনুষ্ঠানে আমরা চিন্তা করেছিলাম একটা magazine তৈরির কথা। আমাদের এই magazine প্রকাশ করার প্রস্তাবটা Maam-ই দিয়েছিলেন। আমাদের ‘FOCUS’-এর সব থেকে বড় এবং সারাজীবন মনে রাখার মতো অভিজ্ঞতা হল আমাদের এই magazine প্রকাশ।

Magazine তৈরির প্রথম পর্বটা ভালই চলছিল। সংক্ষিপ্ত বিজ্ঞপ্তিতেও সবাই সময়মতো লেখা জমা দিয়েছিল। শুরু হল দ্বিতীয় পর্ব, আমরা ভাবিনি যে আমরা আমাদের magazine-এর টাইপিং-এর কাজ করব, কিন্তু আমরাই তা করেছিলাম, শিক্ষক সৌরভ রায় চৌধুরী-এর অনুপ্রেরণায়। আমরা টাইপ-ও করছি, লেখাও জমা পড়ে যাচ্ছে। কম্পিউটারে বাংলা টাইপ করতে গিয়ে সবথেকে বড় সমস্যা ছিল যুক্তাক্ষর লেখা। Avro typing একমাত্র জানত তিয়াশা, কোন্ অক্ষরের সাথে কোন্ অক্ষর যোগ করলে কোন্ অক্ষরের উৎপাদন হবে সে বিষয়ে আমরা অধিকাংশই ছিলাম অজ্ঞ। এইভাবে বাংলা যুক্তাক্ষরের সাথে যুদ্ধ করে শেষ হল টাইপিং। তিয়াশার সাথে সাথে অরিত্র, সৌভিক, তৎকালীন দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র সৌরভ বণিক এবং আমরা আরও অনেকে মিলে টাইপিং-এর কাজ শেষ করলাম। তৃতীয় পর্বে magazine-এর প্রচ্ছদ তৈরি হল। আমাদের মধ্যে প্রসূন এর সিংহভাগটা করেছিল। কিন্তু magazine-এর নাম কি দেওয়া যায় তা নিয়ে মহাচিন্তায় পড়লাম আমরা। সবাইকে বলা হল নিজের মতো করে একটা নাম ঠিক করতে এবং পরে সবার তৈরি করা নামের মধ্যে থেকে একটা বেছে নেওয়া হবে। আমাদের কার্যক্রম আত্মস্বায়ক ছিল সৌম্য মুখার্জি। সবার দেওয়া নামকে পিছনে ফেলে এগিয়ে এল সৌম্যর দেওয়া

‘FOCUS’ নামটা। এরপর শুরু হল আমাদের magazine ছাপার কাজ। এই কাজের অভিজ্ঞতার কথা আমার পক্ষে বর্ণনা করা অসম্ভব, কারণ, যে বা যারা ওই কাজে নিযুক্ত ছিল তারাই জানে তাদের ওপর দিয়ে কি ঝড় বয়ে গেছে। শুধু একটা কথাই বলতে চাই যে কাজটা খুব সহজ ছিল না।

অবশেষে ১৯শে ফেব্রুয়ারী, ২০১৭ –তে প্রকাশিত হল আমাদের magazine ‘FOCUS’। এই magazine-টা প্রকাশিত হওয়ার সাথে সাথে আমরা জানলাম যে – আমরা শুধুমাত্র পদার্থবিদ্যা নিয়েই যে পড়ে আছি তা নয়, আমরা একটা গোটা বই প্রকাশ করার ক্ষমতাও রাখি।

আমরা আর কয়েকদিন পর এই কলেজের পাঠ চুকিয়ে প্রাক্তন হয়ে যাব, কেউ চলে যাবে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করতে, কেউবা চাকরিজীবন বেছে নেবে। আমাদের পরে আরো অনেক নতুন ছাত্রছাত্রী আসবে, ‘Reunion Programme’ সংগঠিত করবে। কিন্তু একটা জিনিস ১৯শে ফেব্রুয়ারী, ২০১৭ থেকে চিরকাল লেখা হয়ে থাকবে যে আমরা যারা ২০১৬-১৭-এর প্রথম বর্ষের ছাত্রছাত্রী, তারাই তৈরি করে গেলাম আমাদের ‘FOCUS’। আমরা হলাম ...Team of Focus ।

Departmental PICNIC 2018

(at Disney Land, Chandannagar)



Department of Physics (Former & Present)

Teaching Staff - Permanent

1. Abani Bhushan Das
2. B. B. Dutta
3. Bimala Prasanna Roy
4. Deb Kumar Mukherjee
5. J. N. Sen
6. Krishnalal Sanyal
7. Mohini Mohan Ghosh
8. Satyendra Nath Ganguly
9. Sukhendu Bikash Chowdhury
10. Balai Bose
11. Murari Mohan Som
12. Priyangshu Sengupta
13. Sudhir Kumar Ghosh
14. Gurubandhu Chowdhury
15. Sushil Kumar Chakraborty
16. Nirmal Kumar Mazumder
17. Bilap Kumar Chakraborty
18. Cittaranjan Dasgupta
19. Nirmal Kumar Dutta
20. Sukhomoy Nandi
21. Provat Kumar Dev
22. Dilip Kumar Gupta
23. Pratip Kumar Sen
24. Ajoy Kumar Joardar
25. Prafulla Kumar Dey
26. Indusekhar Kundu
27. Soroj Kumar Dey
28. Madhusudan Dutta
29. Prafulla Kumar Das
30. Hemendralal Catterjee
31. Ashok Kumar Mukherjee
32. Ashok Kumar Sen
33. Tarakeswar Das
34. Tarun Kumar Tapadar
35. Rupayan Bhattacharya
36. Bhupati Chakraborty
37. Prasanta Kumar Das
38. Dipak Kumar Chakraborty
39. Achyut Kumar Chakraborty
40. Kartik Kumar Kundu
41. Dipak Kumar Nath
42. Swapan Kumar Dutta
43. Amitava Pal
44. Aniruddha Roy
45. Nikhilendu Bandyopadhyay
46. Suman Kumar Roy
47. Mitali Middya
48. Apurba Kumar Bandyopadhyay
49. Mita Mondal
50. Samapti Pal

51. Partha Bandyopadhyay
52. Amiya Bhushan Biswas
53. Kausik Mukhopadhyay
54. Somdeb Chakraborty
55. Anshuman Nandy

Teaching Staff - Guest

1. Amit Ganguli
2. Anjan Pal
3. Nabakumar Ghosh
4. Shaikh Safikul Alam
5. Debabrata Deb
6. Debabrata Ghorai
7. Pradip Kumar Mondal
8. Sudeshna Chakraborty
9. Prantik Nandi
10. Nabanita Das
11. Injamul Alam
12. Kritika Roy
13. Kaushik Mondal
14. Debasmita Samanta
15. Tapan Kumar Sashmal
16. Sourav Roychowdhuri
17. Bipul Mondal
18. Debdali Banerjee
19. Sujoy Kumar Mondal

Graduate Laboratory Instructor

1. Kalyan Samajpati

Non-teaching Staff

1. Atul Chandra Nayek
2. Baikuntha Nath Paramanik
3. Bishnupada Ghosh
4. Budhai Ram
5. Chinmoy Acharya
6. Dilip Kumar Majumder
7. Ganesh Chandra Pal
8. Gopal Maity
9. Jagnarayan Ram
10. Kalpataru Nayek
11. Panchu Ram
12. Pradip Chakraborty
13. Ramlal Ram
14. Sadhan Chandra Mallick
15. Sanjeev Mondal
16. Taraknath Das
17. Uchit Das